৪৫

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া (একটি ঘটনা-সমীক্ষা)

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা

মোশারফ হোসেন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মে, ১৯৯৩

বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া (একটি ঘটনা-সমীক্ষা)

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা

মোশারফ হোসেন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মে, ১৯৯৩

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রের গবেষণা বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে । আশা করা যায়, এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত ঘটনা-সমীক্ষাগুলো কেন্দ্রের পাঠক্রমগুলোতে, বিশেষ করে, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন পাঠক্রম এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্সে, সরাসরি ব্যবহার করা যাবে । ঘটনা-সমীক্ষা (Case Study Method) একটি শক্তিশালী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি । কেন্দ্রের পাঠক্রমগুলোতে ব্যবহৃত হতে পারে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত এমন ঘটনা-সমীক্ষার সংখ্যা খুবই কম । এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমরা আশা করি ।

এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো প্রণয়নে কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা পরিকল্পনা করার জন্য কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই ।

কেন্দ্রের গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মো: আতাউর রহমান ঘটনা-সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহে মাঠ পর্যায়ে অনেক পরিশ্রম করেছেন । প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো ঘটনা-সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছিল । কিন্তু কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাছাই করে সীমিত সংখ্যক ঘটনা সমীক্ষা এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে । ঘটনা-সমীক্ষা প্রণয়নে তাঁর পরিশ্রম ও ধী-শক্তির জন্য ধন্যবাদ জানাই । জনাব মো: জসীম উদ্দীন এ প্রকল্পে সাচিবিক সহায়তা অত্যন্ত দক্ষতার সংগে প্রদান করেছেন । মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত ঘটনা-সমীক্ষাগুলো বার বার মুদ্রণ ও কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণ করেছেন । তাঁর এ সহায়তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি । শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিশ্লেষণধর্মী করে তুলতে এ সমীক্ষাগুলো কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, সেটিই হবে এর প্রকৃত মূল্যায়ন । তাঁদের মতামতের আলোকে এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো আরো কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হবে ।

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা

মোশারফ হোসেন

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
	মুখবন্ধ		
১।	প্রাথমিক কথা		১
২।	ঘটনা-সমীক্ষা-১ :	আলাউদ্দিন মটর ওয়ার্কশপ	৩
	ঘটনা-সমীক্ষা-২ :	ফুটপাতে অনানুষ্ঠানিক কসমেটিকের দোকান	৭
	ঘটনা-সমীক্ষা-৩ :	মৃৎশিল্প	১২
	ঘটনা-সমীক্ষা-৪ :	হালিমার আশা	১৯
	ঘটনা-সমীক্ষা-৫ :	The Stigma of the Caste System	৩১
	ঘটনা-সমীক্ষা-৬ :	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা	৩৬
৩।	ঘটনা সমীক্ষার বিশ্লেষণ		৩৮
৪।	পরিশিষ্ট-১		৪০
৫।	অন্যান্য তথ্য		৪২

প্রাথমিক কথা

কোন দেশের সমাজ কাঠামোর সংগে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা খতিয়ে দেখা বা এর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই হ'লো এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলোর (পরিশিষ্ট-১) মূল লক্ষ্য । এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো পাঠ করলে এবং এর সংগে যে সমস্ত নির্দেশনা দেয়া আছে তা অনুসরণ করলে একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে বাংলাদেশের উন্নয়নে/উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এ দেশের সমাজ কাঠামো আমাদের অজান্তে কি ভূমিকা রেখে চলেছে তা পরিস্কার হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি । এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশ করবে না । ঘটনা-সমীক্ষাগুলো কেবল আলোচনা ও বিশ্লেষণের সূত্রপাত করবে, অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সাহায্য করবে, নতুন চিন্তা ও চেতনার পরিবেশ তৈরী করবে ।

সবগুলো ঘটনা-সমীক্ষাই বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে । ঘটনা-সমীক্ষা বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি । সে দিকে লক্ষ্য রেখে ঘটনা-সমীক্ষাগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যে পাঠকের মনে হবে এ সমীক্ষাগুলোতে আরো তথ্য দেয়া যেতো । কিন্তু ইচ্ছে করেই সেটি করা হয়নি, করলে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে এর যে আবেদন তা ক্ষুন্ন হতো । ঘটনা-সমীক্ষাগুলোর মধ্যে যে সমস্ত অসম্পূর্ণতা রয়েছে বলে পাঠক মনে করবেন সেগুলো পাঠক নিজ মেধা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাপ্ত করবেন । এটিই এ ঘটনা-সমীক্ষাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

নিম্নলিখিত ৫টি ঘটনা-সমীক্ষা এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে:

- ঘটনা-সমীক্ষা-১ : আলাউদ্দিন মটর ওয়ার্কশপ
  ঘটনা-সমীক্ষা-২ : ফুটপাতে অনানুষ্ঠানিক কসমেটিকসের দোকান
  ঘটনা সমীক্ষা-৩ : মৃৎ শিল্প
  ঘটনা সমীক্ষা-৪ : হালিমার আশা (সংগৃহীত)
  ঘটনা সমীক্ষা-৫ : The Stigma of the Caste System (সংগৃহীত)
  ঘটনা সমীক্ষা-৬ : বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

উপর্যুক্ত প্রতিটি ঘটনা-সমীক্ষার শেষে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে । পাঠক এক একটি ঘটনা-সমীক্ষা পাঠ করার পরে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব চিন্তা করবেন, নিজের অভিজ্ঞতা বা নিজের জ্ঞানের সংগে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন । মনে কোন নতুন প্রশ্নের উদয় হলে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন, আলোচনা করবেন ।

এ ঘটনা-সমীক্ষা প্রতিবেদনের সবশেষ অধ্যায়ে প্রতিবেদকদ্বয় ঘটনা-সমীক্ষাগুলোর একটি বিশ্লেষণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন । পাঠক এ বিশ্লেষণের সংগে একমত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন । যদি একমত না হন, তা'হলে পাঠক তার নিজস্ব বিশ্লেষণ দেবেন ।

শ্রেণীকক্ষে এ ঘটনা-সমীক্ষা সম্পর্কে ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এক বা একাধিক প্রশিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এ ধরনের প্রশিক্ষকদেরকে ঘটনা-সমীক্ষা পদ্ধতি (Case Study Method) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে । একই সাথে উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রশাসন, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা বান্ছনীয় । প্রশিক্ষক এখানে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা স্বতপ্রণোদিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন ।

আলাউদ্দিন মটর ওয়ার্কশপ

আলাউদ্দীন সুদর্শন, চটপটে, বাচনে যশোহরের আন্চওলিকতার ছাপ। জন্ম ১৯৬৫; সাভার আলাউদ্দীন মটর ওয়ার্কশপের মালিক। আলাউদ্দীনের বাবার নাম ওয়াজেল মোল্লাহ। তিনি পেশায় একজন কৃষিজীবি। তাঁর গ্রামের বাড়ী উদালীয়া, পো: পরীশংকরপুর, থানা-ঝিনাইদাহ সদর, জেলা-ঝিনাইদাহ। আলাউদ্দীনের পিতা বয়সে ৬০/৬৫ বছরের বৃদ্ধ হলেও তিনি কৃষিকাজ থেকে দূরে সরে যাননি বরং মাত্র ১০/১৫ বিঘা জমি এবং তাঁর কৃষিকাজ দিয়েই ২ ছেলে ও ৮ মেয়েকে বড় করে তুলেছেন। খুব একটা সচ্ছলতা তার পরিবারে ছিলনা বটে; তবে কষ্ট করে হলেও তা তিনি করেছেন।

আলাউদ্দিন যখন গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়তেন, তখন পড়াশুনার ফাঁকে ফাকে তাঁকে কৃষিকাজ করতে হয়েছে তার বাবার সাথে, সুতরাং তার পড়াশুনায় যেমন অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, ঠিক তেমনি সমস্যা হয়েছে সে সঠিকভাবে মন দিয়ে কাজও করতে পারেনি। তাকে সেই কৃষিকাজ করতে গিয়ে অনেক সময় বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছে। আলাউদ্দীন অবশ্য শেষ পর্যন্ত এস.এস.সি পরীক্ষা পাশ করেছে। "গ্রামে থেকে লাভ নেই বরং শহরের দিকে গেলে কাজ পাওয়া যাবে, ফলে নিজের জীবন চলবে এবং সাথে সাথে পড়াশুনাও হবে"। সে এ কথাটি গ্রামের সকলের কাছেই শুনতে থাকে।

আলাউদ্দীন ঢাকায় আসে ১৯৮৩ সালে যখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর। অনেক অনিশ্চয়তা। কেননা তার কোন ভিত নেই এখানে - নেই তেমন কোন শিক্ষা - নেই অর্থ। এ অনিশ্চয়তা নিয়েই সে তাঁর একমাত্র চাচার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সে গ্রাম থেকে একটি কথাই বার বার মনে করে এসেছে যে, তাকে বড় হতে হবে - তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে যে জার্মান টেকনিক্যাল সেন্টারে ভর্তি হবে এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে যা হয় একটা কিছু করবে।

তাঁর চাচা চাকুরী করেন সিএন্ডবি অফিস, মহাখালীতে। চাচার বাড়ীতে উঠলে চাচা মন খারাপ করেননি। কিন্তু তার অবস্থা এমন ভালও নয় যে, তিনি ভাইয়ের ছেলে আসার কারণে খুব আনন্দবোধ করবেন। কেননা ঢাকায় জীবন ধারন খুবই কঠিন।

ঢাকা এসে আলাউদ্দীন দেখল অবস্থা পুরোপুরিই ভিন্ন। অর্থাৎ সে গ্রাম থেকে যা চিন্তা করে এসেছে তা এখানে করা সম্ভব নয়। কেননা অবস্থা তার প্রতিকূলে। তাকে তার চাচা এবং অন্যান্যরা বুদ্ধি দিলেন যে, জার্মান টেকনিক্যাল সেন্টারে ভর্তি না হয়ে বরং অন্য যে কোন একটি ভাল মটর ওয়ার্কশপে কাজ নিলে সেটি ভাল হবে। এমতাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই কঠিন। কেননা তার তখন বয়স মাত্র ১৮। তবুও সে নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা এবং অন্যান্য বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে সে একটি মটর ওয়ার্কশপে কাজ করবে।

১৯৮৩ সালেই আলাউদ্দীন কুদ্দুস মটর ওয়ার্কশপে কাজ শুরু করে। ঐ মটর ওয়ার্কসপে কোন বেতন ছাড়াই দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত কাজ করে। ফলে উপকৃত যা হবার তা হয়েছে ঐ মটর ওয়ার্কসপ। আর আলাউদ্দীনের যা হয়েছে তা হচ্ছে সে কিছুটা কাজ শিখেছে। সেই সাথে সাথে তার মন-মানসিকতাও পরিবর্তিত হতে থাকে। সে চিন্তা করল এভাবে বিনা বেতনে কাজ করলে নিজের কাজ শেখা হয় ঠিকই, কিন্তু কিছু উপার্জনেরও প্রয়োজন; তা নাহলে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কিভাবে? তাই সে সিদ্ধান্ত নিলো এ ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও কাজ করবে এবং বিনিময়ে কিছু অর্থও উপার্জন করতে পারবে। ১৯৮৫ সালে কাজল মটর ওয়ার্কশপ নামে আরেকটি ওয়ার্কশপে কাজ জুটিয়ে নিল। এখানে অবশ্য সে পেটে-ভাতে কাজ করতে লাগলো। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মটর ওয়ার্কশপ কর্তৃপক্ষ তাকে খাবারসহ কিছু বেতন প্রদান করে। যতই দিন যেতে থাকে ততই তার কাজের মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই তার কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার মানসিকতাও পরিবর্তিত হতে থাকে। ক্রমেই সে ভাবতে থাকে সে নিজে একটি মটর ওয়ার্কশপ স্থাপন করবে। একথা সব সময়ই তাকে তাড়িত করছিল। এভাবেই দেখতে দেখতে কাজ করতে করতে চার সাড়ে চার বছর প্রায় কেটে যায়। অর্থাৎ ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত এই মটর ওয়ার্কশপেই তার সময় কাটে। এই মটর ওয়ার্কশপে থাকাকালীন সময়ে তার খাওয়া-দাওয়া/কাপড় বাবদ খরচ বাদ দিয়ে তার কিছু কিছু সঞ্চয় হতে থাকে। অবশেষে সে ১৯৮৯ সালে কাজল মটর ওয়ার্কশপ থেকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটি মটর ওয়ার্কশপ স্থাপন করে। অন্য কেউ হলে হয়তো এত কম Tools দিয়ে এ ধরনের মটর ওয়ার্কশপ চালু করার সাহস পেত না। এভাবেই তার মটর ওয়ার্কসপটি চলতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সে একজনের কাছ থেকে মূলধন হিসেবে ঋণ নিয়েছিল ১০,০০০ টাকা।

১৯৮৯ সালে আলাউদ্দীন মটর ওয়ার্কশপটি স্থাপন করার পর আলাউদ্দিনের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। সে ১৯৯০ সালে এখানকার অর্থাৎ সাভার থানার স্থানীয় একজন অধিবাসীর মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের পর তার নতুন এক জীবন শুরু হয়। তার মাথায় নতুন নতুন চিন্তা কাজ করতে লাগলো। সে একটি বাড়ী ভাড়া করে যার ভাড়া প্রতিমাসে প্রায় ৭৫০.০০ টাকা। এই বাড়ীতে ২টি কামরা + একটি বাথরুম এবং একটি রান্না ঘর রয়েছে। এ ভাড়ার মধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহ + পানি সরবরাহ + গ্যাস সরবরাহ এর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তার জীবনে এখন কিছুটা আনন্দ বইছে। এর প্রায় দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৯২ সালে একটি কণ্যা সন্তানও তার সংসারে জন্ম নেয়। ফলে আনন্দের মাত্রা আরেকটি যোগ হল।

তাঁর পরিবারে মাসিক ৩০০০-৩৫০০ টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের মধ্যেই তার বাড়ী ভাড়ার টাকা ধরা হয়েছে। পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে আলাউদ্দীন নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর একটি সদ্য নবজাত কন্যা সন্তান - এই মোট তিন জন। দৈনন্দিন খাবারের মেনুতে মোটামুটি পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার থাকে। অর্থাৎ এখন আর তার সেই পূর্বের ঝিনাইদহ কিংবা ঢাকার প্রথমাবস্থা নেই।

পারিবারিক মাসিক খরচ মিটিয়েও তাঁর মাসিক উপার্জন থেকে ক্রমেই সঞ্চয় হতে থাকে। "আলাউদ্দীন মটর ওয়ার্কশপ" এর মাসিক গড় উপার্জন ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা হয় সকল ব্যয় মিটানোর পর। এ মটর ওয়ার্কশপে সে অন্য আরেকজন অংশীদার নিয়েছে যার নাম মো: আজিজুর রহমান। সম্পর্কে এই জনাব রহমান আলাউদ্দীনের স্ত্রীর বোনের স্বামী অর্থাৎ ভায়রা ভাই। তিনি একজন বি,কম পাশ শিক্ষিত ব্যক্তি। বর্তমানে ঐ ওয়ার্কশপটিতে প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি (Tools)সহ এবং নগদ টাকা প্রায় দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োজিত রয়েছে। এই সম্পত্তি বলতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools) এবং ডেনটিং সেকশনের গ্যাস সিলিন্ডারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Tools)কে দেখানো হয়েছে। এ সকল সম্পদের/মূলধনের অর্ধেক হচ্ছে আলাউদ্দীনের এবং আর অর্ধেক জনাব মো: আজিজুর রহমানের। আলাউদ্দীন গড়ে প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকারও উপর এই মটর ওয়ার্কশপ থেকে উপার্জন করে।

আলাউদ্দীন ওয়ার্কশপের মাসিক ব্যয় নিম্নরূপ :

১।	ঘর ভাড়া (দালান)	২,০০০ টাকা	
২।	ফোরম্যান ২জনX২,৮০০=	৫,৬০০ "	
৩।	হাফ মিস্ত্রী ৩জনX ৬০০=	১,৮০০ "	
৪।	হেলপার ৮জন X ৩০০=	২,৪০০ "	(পেটে/ভাতে হিসাব ধরা হয়)
৫।	মিস্ত্রী (ডেন্টিং) ১জনX৩০০০=	৩,০০০ "	
৬।	হেলপার " ১জনX ৩০০=	৩০০ "	"
৭।	অন্যান্য	৫০০ "	(টেলিফোন বিলসহ)
	মোট ব্যয়	১৫,৬০০ "	(আনুমানিক)

উল্লেখ করা যায় যে, এ ছাড়াও কয়েকজন (৫) কর্মচারী রয়েছে যারা এই ওয়ার্কশপের অধীনে কাজ করছেন। কিন্তু কোনরূপ অর্থ নিচ্ছে না। এখানে সেই আলাউদ্দীনের নিজের জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়; যখন তিনি নিজেই এরূপ একজন শিক্ষানবীস কর্মচারী ছিল।

<u>প্রশ্ন</u> :

ক) বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিতে আলাউদ্দিনের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করুন।

খ) আলাউদ্দিনকে শহরে আকৃষ্ট করার পেছনে কি কি কারণ আছ বলে আপনার মনে হয় ?

গ) আলাউদ্দিনের পেশা নির্বাচনে সমষ্টিক পরিকল্পনার কি ভূমিকা রয়েছে ?

ঘ) আলাউদ্দিনের বর্তমান অবস্থায় কি কি সহায়ক শক্তি কাজ করেছে ?

ফুটপাতে অনানুষ্ঠানিক কসমেটিকের দোকান

সন্ধ্যা সাতটা । লাল-নীল, সাদা-কালো, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি নানা রং-এর কার, জীপ, ট্রাক, স্কুটার, ঠেলাগাড়ী, রিক্সা, বাই-সাইকেল এবং মিনিবাস, বাস সবই ছুটে চলছে । কখনও গাড়ীর ইন্জিনের শব্দ, কখনও বা যানবাহনের ভেঁপু'র শব্দ, এছাড়া লোকজনের মুখের ভাষা, এসব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জটিল অবস্থা । কেউ হাটছে ফুটপাথ দিয়ে আবার কেউ হাটছে বড় সড়ক পথ দিয়ে - সড়ক পথের মাঝ দিয়ে । সড়ক পথের মাঝ দিয়ে হাটবেই বা না কেন । কারণ ফুটপাথ তো আর ফুটপাথ নয়, সেটা হয়ে গেছে এখন নগরের অনানুষ্ঠানিক ব্যবসা কেন্দ্র বা বাজার । এ কারণেই একজন ফুটপাত দিয়ে হাটতে গিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা খাচ্ছে অন্য আর এক জনের সাথে । কেউ হয়তো একদিক চেয়ে হাটতে গিয়ে অন্য কোন দোকানীর দোকানে হোচট খেয়ে উপুর হয়ে পরছে । তবুও লোকজন ছুটে চলছে । এলাকাটি অত্যন্ত পরিচিত । ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট পূর্ব ব্লক এর উল্টো দিকে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট এর সামনে ফুটপাত এলাকা । পাশেই রয়েছে গাউছিয়া মার্কেট এবং ঢাকা কলেজ । কেউ কেনা-কাটা করছে, আবার কেউ হয়তো শুধুমাত্র দাম জেনেই চলে যাচ্ছে ।

মিজান একজন ছোট কসমেটিক দোকানী । তাঁর এ কসমেটিক দোকানে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী কেনা-বেচা হয়, তা হচ্ছে মেয়েদের শ্রী-বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এ দোকানের এক পাশে টি-শার্ট এর দোকান, অপর পাশে রয়েছে হোসিয়ারী অর্থাৎ বাচ্চাদের গেন্জি, মোজা, জাংগিয়া এর দোকান । ঠিক সামনে রয়েছে কাঁচ/গ্লাস সীট এবং তোয়ালে, বিছানার চাদর এর দোকান । আরও বিভিন্ন ধরনের যেমন:. বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, বাদাম, শার্ট, ফল, জুতা বিক্রয়ের দোকান প্রভৃতি । এ ধরনের দোকান একটি দু'টি নয়; একই দ্রব্যের দোকান একাধিক । তবুও সবগুলো দোকানে কেনা-বেচা ভালই চলছে । এ বাজারটিতে যারা দোকান পসার সাজিয়ে বসেছে তাদের মধ্যে কেউ নাবালক, কেউ ২০ বছর বয়স্ক আবার কেউ ২০ বছরের চেয়ে বেশী বয়স্ক লোক । এদের কেউ লেখা পড়া করেছে আবার হয়তো কেউ তেমন একটা লেখা পড়া করেনি । মিজান তাদেরই একজন ।

পুরো নাম : মো: মিজানুর রহমান

বয়স : ২০ বৎসর

বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
ঠিকানা	:	গ্রামের নাম - কাজীনগর ইউনিয়ন - ৭ নং থানা - রাজগন্জ জেলা - লক্ষীপুর
পেশা	:	কসমেটিকের ছোট দোকান/ব্যবসা
ভাই-বোন	:	৩ ভাই
বর্তমান ঠিকানা	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী স্টাফ কোয়ার্টার, নীলক্ষেত, ঢাকা ।
বাবার নাম	:	আবু তাহের
বয়স	:	৫০ বৎসর (আনুমানিক)
ভাই-বোন	:	তিন ভাই
পেশা	:	কৃষিকাজ করা/গৃহসহালীর কাজ করা। অন্য এক ভাই রংপুরে ধানের কলের ব্যবসা করে এবং অপরজন কৃষিকাজ করে রামগন্জে ।

১৯৮৭ সালে মিজান তাঁর গ্রামের বাড়ী ছেড়ে ঢাকাতে চলে আসে চাকুরী করার উদ্দেশ্যে । তাঁর চাচার বড় ছেলে তাঁর দোকানে চাকরী দিয়ে মিজানকে ঢাকায় নিয়ে আসে । মিজান তখন থেকেই এই ব্যবসায় আসে । অর্থাৎ তাঁর দোকানেই মাসে থাকা খাওয়াসহ ১৫০ টাকা বেতনে মিজান চাকুরী শুরু করে ঐ সময় থেকে । ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ঐ দোকানে মিজান সেল্‌স ম্যান হিসেবে কাজ করে ।

এরপর মিজান এই ব্যবসা ভালভাবে বুঝে ১৯৯১ সাল থেকে চাকুরী ছেড়ে নিজেই এ ব্যবসা শুরু করে । তখন থেকেই তাঁর নিজ ব্যবসা জীবন শুরু হয় । এ ব্যবসায় আসার কারণ তাঁর গ্রামে পড়াশুনার তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা না থাকা । তাঁর বাবার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণ, নিজ জীবনে আর্থিক উপার্জন করা । সম্ভব হলে তাঁর বাবা-মাকে আর্থিক সাহায্য করা ।

১৯৯১ সালে মাত্র ২২০০ টাকা পুঁজি নিয়ে মিজানের ব্যবসা শুরু হয় । বর্তমানে তাঁর দোকানে ৫-৬ হাজার টাকার মালামাল রয়েছে । এর মধ্যে দু'হাজার টাকার মালামাল রয়েছে ঋণ হিসেবে । অর্থাৎ মালা-মাল বিক্রয় করার পর সেগুলোর মূল্য পরিশোধ করা হবে । অবশিষ্ট সমস্ত অর্থই মিজানের নিজের ।

বর্তমানে তাঁর দোকানে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ : মহিলাদের চুলের ফিতা, বেন্ড, রবার বেন্ড, চুলের ক্লিপ, কানের দুল, নাক ফুল, হাতের চুড়ি, বালা, নেইল পলিশ, লিপস্টিক, লিপ সাইন, নেইল পলিশ রিমুভার, কপালে লাগানোর টিপ, রোজ-পাউডার, চিক্ পাউডার, মাসক্ সামগ্রী, পেইন্ট বক্স, হেয়ার ডাইং, আই ভ্রু পেনসিল, পায়ের মল, আংটি, পমেড ক্রীম । এ ছাড়া যে দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে তা হচ্ছে কাপড় আটকানোর ক্লিপ, সাবান কেস প্রভৃতি ।

সন্ধ্যা সাতটা বিশ মিনিটের সময় লক্ষ্য করা যায় যে, সাদা রংগের হিউন্ডাই (কোরিয়ান) কার নং ঢাকা মেট্রো-ক-০৩-১১৪৫-এ চড়ে একজন ভদ্র মহিলা এবং তাঁর ১২/১৩ বছরের একটি মেয়ে মিজানের দোকানে আসে - তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য। তারা তাদের পছন্দনীয় দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে দর কষাকষি করে ১৪০/- টাকার দ্রব্য-সামগ্রী ১০০/- টাকায় ক্রয় করে । কিন্তু এও লক্ষ্য করা যায় যে, মিজানের পাশের দোকানে টি শার্ট বিক্রয় করে সেখানে ঐ ক্রেতাই ৪২০/- টাকার টি শার্ট টি ৩৫০/- টাকায় ক্রয় করে নিয়ে যায় । উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ২০% লাভে দ্রব্যটি বিক্রয় হয় ।

মাসিক আয়-ব্যয়

গড়ে প্রতিদিনে বিক্রয় হয় ৪০০/- X ৩০ দিন = ১২,০০০/- টাকা

২০% লাভে বিক্রয় করে মাসিক উপার্জন = ২,৪০০/- "

গড়ে মাসিক ব্যয়:

বাড়ী ভাড়া	১৫০/-	টাকা
খাওয়া বাবদ	১,০০০/-	"
দৈনিক বকশিস গড়ে মাসে দেয়	৬০০/-	" (লাইনম্যানকে)
মালামাল জমা রাখা বাবদ	১৫০/-	"
অন্যান্য	১০০/-	"
গড়ে মোট খরচ	২,০০০/-	"

সুতরাং মাসিক সঞ্চয় হয় ৪০০/- টাকা যা তার বাবাকে গ্রামের বাড়ীতে পাঠাতে হয় ।

মিজানের এ ব্যবসায় কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে যেহেতু খোলা আকাশের নীচে ফুটপাতে বসে ব্যবসা করতে হয়; সেহেতু বৃষ্টি হলে তাঁর দোকান বন্ধ করতে হয় । আবার রোদ-খড়া, ঝড়েও ব্যবসা চালাতে খুবই অসুবিধা হয় । সবচেয়ে বেশী যে সমস্যা হয় তা হচ্ছে মাঝে মাঝে পুলিশ আসে তাদেরকে ফুটপাত থেকে তুলে নিতে । কেননা ফুটপাতে যে কোন রকম ব্যবসাই বেআইনী । সিটি কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী ফুটপাত শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য । মূলধনের অভাব এটিও তার একটি সমস্যা । প্রতিদিন ব্যবসা শেষে অবিক্রিত দ্রব্য-সামগ্রী রাতে জমা রাখাটাও একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ।

মিজানের ব্যবসায় যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান সে নিজেই করেছে । বৃষ্টির জন্য একটি বড় পলিথিন রেখেছে যা দিয়ে ঢেকে রাখে। আবার বৃষ্টি শেষে তা সরিয়ে ফেলে ।

মিজানকে প্রতিদিন ২০/- টাকা দিতে হয় ফুটপাতে বসার জন্য । আর তাই সে প্রতিদিন ঐ পরিমাণ টাকা তাদের (ব্যবসায়ীদের) একজন প্রতিনিধি(লাইনম্যান) এর হাতে তুলে দেয় । এই প্রতিনিধি এ ধরনের ফরিয়া প্রতি দোকানীর কাছ থেকে ২০/- টাকা প্রতিদিন হারে চাঁদা/তোলা সংগ্রহ করে থাকে এবং মাস শেষে সর্বমোট সংগৃহীত অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয় । এভাবেই সমস্যার সমাধান করা হয় ।

আরেকটি সমস্যা যেমন রাতে ব্যবসা শেষে অবিক্রিত মালামাল রক্ষিত করে রাখা। এ সমস্যারও সমাধান সে করেছে । এ ধরনের ব্যবসায়ীগণ যেভাবে মার্কেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রক্ষিত রাখে মিজানও ঠিক সেভাবেই ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ভিতরে ঢুকিয়ে রক্ষিত অবস্থায় রাখে । এজন্যে অবশ্য প্রতিমাসে ১৫০/- টাকা ব্যয় করতে হয় ।

মিজান এ ধরনের ব্যবসা থেকে ভবিষ্যতে কি করবে এবং এ ব্যবসার ভবিষ্যত কি? এর জবাবে জানা যায় যে, সে ক্রমেই এ ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চেষ্টা করবে এবং সহজ শর্তে ঋণ পেলে তার এই ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করবে বলে জানায় ।

যে কেউ এ ব্যবসা করতে পারে । এতে নির্দিষ্ট কোন স্থান বা ঘর নেবার প্রয়োজন হয় না । মূলধন ও তেমন একটা প্রয়োজন হয় না । অর্থাৎ কম মূলধন দিয়েই এ ব্যবসা শুরু করা যায় । পুলিশ যে কোন কারণে তাড়া করলে কম সময়ে এ ব্যবসার

মালামাল নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব । কম বিনিয়োগে শতকরা (%) বেশী লাভ করা সম্ভব। কোন নির্দিষ্ট স্থান/ঘরের প্রয়োজন হয় না বলে কোন দোকান ভাড়া দিতে হয়না। বিদ্যুৎ, পানি বা গ্যাসের কোনটারই প্রয়োজন হয় না । ক্রেতারাও যানবাহন থেকে নেমেই সরাসরি এ ধরণের দোকানে প্রবেশ করতে পারে । এছাড়া যারা ফুটপাত দিয়ে চলাচল করছে তাঁরা সব সময়ই তাঁদের দৃষ্টির আওতায় এ দোকান পাচ্ছে । যেহেতু এ ধরনের দোকানের ঘর ভাড়া নেই, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ এর কোন ব্যয় নেই, অংগসজ্জা নেই, কোন কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন নেই, সেহেতু এ ধরনের দোকানের দ্রব্য-সামগ্রী/মালামালের বিক্রয় মূল্যে কম ধরা হয় । তাই ক্রেতারাও এ ধরনের দোকান থেকেই দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতে ইচ্ছুক বেশী হয় । কারণ তাঁরা একই দ্রব্য উন্নত বড় দোকানের চেয়ে এ ধরনের দোকানেই কম মূল্যে পাচ্ছে । তাই তাঁরা এ ধরনের দোকানেই যায় বেশী, দোকানও তাই চলে ভাল ।

প্রশ্ন :

ক) মিজানকে শহরে আকৃষ্ট করার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনার মনে হয় ?

খ) এখানে চাঁদা তোলার বিষয়টি সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন ?

গ) অনানুষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থায় সমাজের কোন দিকটি প্রভাব বিস্তার করেছে ?

ঘ) মিজানের এ ব্যবসায় উন্নতির পেছনে কি কারণ রয়েছে ?

মৃৎশিল্প

নাম তাঁর সুবাশ পাল; বয়স আনুমানিক ৪৫ বৎসর । কেউ না বললে তাঁকে বিদেশী বলে অনুমান করবেন সবাই । বাড়ী ঢাকা শহরের রায়ের বাজার এলাকায় 'আখুরা' নামক স্থানে ।

ঘরের বারান্দায় বসে সুবাশ মাটির কাজ করছিলেন - এশ্ট্রে তৈরীর কাজ । নিখুঁত হাতের কাজ । একটি হুইল সংযোজিত টেবিলের উপর বসে কাজ করছিলেন এবং কথা বলছিলেন । হুইল টেবিল হচ্ছে চার পা বিশিষ্ট কাঠের একটি টেবিল যার সাথে একটি সাইকেলের চেইন এবং প্যাডেল সংযুক্ত করে একটি বিশেষ প্রযুক্তি/যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে, এ ধরনের মৃৎ শিল্পের জন্যে ।

মৃৎ শিল্পের সাথে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক বলতে যেয়ে তিনি বলেন, বাবা, দাদা - সবাই এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । তাঁর বাবা ছিলেন নীহার রঞ্জন পাল যিনি বয়সে ছিলেন প্রবীন এবং প্রায় অন্ধ । সেই যুদ্ধের কথা, ১৯৭১ সালের এক ভয়াল অন্ধকার কালো রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তাঁকে (বাবাকে) হাত, চোখ, মুখ, পা বেঁধে সেই যে নিয়ে যায় আর তাঁকে খুজে পাওয়া যায়নি । বাবা হারানোর শোকে সুবাশ কিন্তু থেমে যাননি তার অগ্রযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন । তিনি বাবার সাথে এ ধরনের মৃৎ শিল্পের কাজ করতেন এবং কাজের ফাঁকে কিছু লেখাপড়াও করতেন । সে সুবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস থেকে একটি সার্টিফিকেট কোর্সও করেন । এরপর থেকে তিনি এ শিল্পকে জীবিকা অর্জনের প্রথম সোপান হিসেবে গ্রহণ করেন । বর্তমানে তিনি বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা) এবং অন্যান্যের সহায়তায় একাজ করে থাকেন । যে কোন ছুটির দিনে পুরো দিন কাজ করেন এ শিল্পের জন্যে । অন্যান্য কার্যদিবসে অফিস থেকে এসে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেন ।

তাঁর মাটির কাজে বেশ কয়েক ধরনের দ্রব্য সামগ্রী তৈরী হয় । যেমন: মাটির পাতিল, মাটির কলস, দই এর পাতিল, মাটির এশ্ট্রে, ফুলদানী, পয়সা জমানোর ব্যাংক প্রভৃতি । প্রতিদিনের উৎপাদন ক্ষমতার ব্যাপারে বলেন কাজের অর্ডার এর উপর নির্ভর করে কতটা একক বা Unit উৎপাদন করতে হবে । অর্থাৎ অর্ডার বুঝে উৎপাদন ক্ষমতা

বৃদ্ধি/কমিয়ে থাকেন । কিন্তু এমন দিন যায় না যে, কোন কাজ তিনি করেননি । কেননা একটি দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করতে কয়েকটি স্তরে কাজ করতে হয় । প্রথমেই মাটি সংগ্রহ করে তা প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দিয়ে গুলিয়ে রাখতে হয়, ২/১ দিন পরে তা ভাল করে মেখে কার্যোপযোগী করে দ্রব্যটির প্রাথমিক স্তরের ধরণ তৈরী করতে হয় । আবার ২/১ দিন পরে দ্বিতীয় স্তরের কারুকাজ (যদি থাকে) করতে হয় এবং তা শুকিয়ে তৃতীয় স্তরের কাজ সম্পাদন করতে হয় । এরপর অন্যদিনে দ্রব্যটির সঠিক স্তরে নিয়ে আসতে হয় এবং তাহলে আগুনে পোড়াবার ব্যবস্থা করা হয় । পোড়াবার পরে প্রয়োজনে আবার দ্রব্যটিতে নিখুঁত আঁচড় দিতে হতে পারে বলে তিনি জানান । সবশেষে পূর্বোক্ত স্তরগুলো পেরিয়ে এলেই কেবল মাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যটি তৈরী হয়েছে বলে ধরা হয় ।

বর্তমানে তিনি নিজে কাজ করেন এবং কাজের অর্ডার/চাহিদা বুঝে ৪/৫ জন সহযোগী নিয়োগ করেন । এ ছাড়া বড় ছেলে এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও কাজে সহযোগীতা দিয়ে থাকেন । অন্যান্য যারা (পরিবার বহির্ভূত) সহযোগী হিসেবে কাজ করেন, তাদেরকে মোট কাজের ৪০% উপার্জন দিতে হয় অর্থাৎ মাসিক বেতনভিত্তিক নয় । উৎপাদনের উপর নির্ভর করে শতকরা হিসেবে প্রদান করতে হয় । মাসিক উপার্জন সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি জানান বছরে প্রায় ১.৫০ - ২.৫০ লক্ষ টাকার মালামাল/দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হয় । এর থেকে কাজের সহযোগীগণকে ৪০% , গ্যাস বিল মাসে প্রায় ৩৫০০-৪০০০ টাকা এবং মিটার ভাড়া ৫০০ টাকা, পানি বিল ২০০-৩০০ টাকা, মাটি ক্রয় তিন গাড়ি (৩৫০X৩)= ১০৫০ টাকা, জ্বালানী খড়ি ক্রয় বাবদ প্রতিমাসে ৫০০ টাকা ব্যয় করতে হয় । বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না কারণ তিনি নিজের বাড়িতে থাকেন তবে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় প্রায় ২০০-৩০০ টাকা প্রতিমাসে । এই হচ্ছে তাঁর আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একটি হিসাব । অর্থাৎ যদি বছরে ২.৫০ লক্ষ টাকায় সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহলে তার ৪০% (১,০০,০০০) টাকা দিতে হয় সহযোগী উৎপাদকগণকে । অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকা থেকেই প্রতিমাসের ব্যয় মিটানোর পর যা নীট উপার্জন হিসেবে থাকে তা হচ্ছে প্রায় ৫০০০-৬০০০ টাকা মাত্র তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ।

আগে তাঁর বাড়িতে শুধুমাত্র মাটির পাতিল, কলসি, সড়াই উৎপাদিত হতো । বর্তমানে সেখানে নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করা হয় । এ ধরনের পরিবর্তনের কথা বলতে যেয়ে তিনি বলেন যুগ বদলেছে, ব্যবহারের ধরনও বদলেছে - এসেছে

আধুনিক সিলভার সামগ্রী, এসেছে কাঁচের সামগ্রী, ষ্টীলের সামগ্রী এবং প্লাষ্টিকের সামগ্রী। তাই যেন মাটির জিনিসপত্রের চাহিদাও কমে গেছে। আর তাই কমেছে এর উৎপাদন। তা'না হ'লে রায়েরবাজার এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম করে হলেও ১৫০০ পরিবার ছিল যারা এই মাটির বা মৃৎ শিল্পের কাজই করতেন।

সুবাশ পাল জানান তিনি আজ পর্যন্ত এ শিল্পকে ধরে রেখেছেন ঠিকই তবে এও ভাবছেন যে, এ শিল্পকে হয়তো তাঁর পরিবারের এমনকি বংশের কেও আর গ্রহণ করবেন না। তাঁর দু'সন্তানের মধ্যে দু'জনই লেখাপড়া করছেন এবং তাঁরা এ শিল্পে আসবেন না। সুবাশের ভাইগণও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। সুতরাং এ শিল্প, আর এ বংশে থাকছে না।

এ কাজের সময় লক্ষ্য করা যায় তিনি সেই হুইল টেবিল এর উপর বসে এষ্টের কাঠামো (Shape) চাকু দিয়ে কেটে/চেঁছে সঠিকরূপ দিচ্ছিলেন। একজন তাঁর সে টেবিলের চাকা/হুইলকে সাইকেলের মত প্যাডেল করছিলেন হাতা দিয়ে। তৃতীয় জন সে সঠিক কাঠামোকে নকশা বা ডিজাইন করছিলেন জ্যামিতি বক্সের কাটা কম্পাসের সাহায্যে। চতুর্থজন সে ডিজাইন করা দাগের উপর আরেকটি ডিজাইন যন্ত্র দিয়ে কেটে কেটে প্রকৃত ডিজাইন করছিলেন। এখানেই এষ্টে তৈরীর শেষ স্তর নয়। সুবাশ বলেন এ কাজের পর আবার তিনটি পর্যায়ে কাজ করে তবেই এর চূড়ান্ত উৎপাদন স্তরে নিয়ে আসতে হয়। সর্বশেষে যে চূড়ান্ত পর্বের উৎপাদিত দ্রব্যটি তা দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর এবং পছন্দনীয়। এভাবেই এক একটি দ্রব্য তৈরীর জন্য কয়েকটি পর্যায়ে কাজ করতে হয়। মাটির কাজে রৌদ্রজ্জোল পরিবেশ এর প্রয়োজন হয় বলে সবার জানা কিন্তু সুবাশ এ মতের বিপক্ষে বললেন, বৃষ্টি বাদলের দিনেও এ শিল্পের কাজ করতে অসুবিধা হয়না অর্থাৎ বৃষ্টি হলেও তাঁর কাজ চলতে থাকে বরং এ ধরনের কাজের দ্রব্য সামগ্রী রোদে না দিয়ে শুস্ক পরিবেশে শুকাতে হয়।

এরপর মাটির দ্রব্য সামগ্রী পোড়ানোর ব্যবস্হা সম্পর্কে বর্ণনা দেন এভাবে তাঁর ওখানে দু'ধরনের ব্যবস্হা রয়েছে। এক ধরন হচ্ছে কাঠ-খড় দিয়ে মাটির পাতিল/কলস পোড়ানো এবং অপরটি হচ্ছে গ্যাস দিয়ে এষ্টে, ফুলদানী, মাটির ব্যাংক, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী পোড়ানোর ব্যবস্হা। অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঢেকে দেয়া হয় কাঠ-খড় দিয়ে মাটির পাতিল/কলসগুলোকে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এর নীচে। আর গ্যাস চালিত

ব্যবসহাটিতে একটি (৫ ফুট X ৫ ফুট প্রায়) লোহা নির্মিত বক্স ব্যবহৃত হয় । এখানে বিভিন্ন অপেক্ষাগৃহে ছোট দ্রব্য সামগ্রী যেমন: এশ্ট্রে, ফুলদানী, মাটির ব্যাংক প্রভৃতি পোড়ানোর কাজ চলে ।

এ পর্যায়ে তিনি আবার বলেন মাটির পাতিল এবং কলস তেমন একটা চলছে না বলেই এসকল দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে মাটির অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করছেন যাকে আধুনিক যুগে হস্তশিল্প বলেই গণ্য করছেন অথবা অনেকে এ ধরনের পন্য সামগ্রীকে সিরামিক সামগ্রীও বলে থাকেন । আর এই নতুন নামে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যাঁরা নিচ্ছেন এমন সংস্হা রয়েছে অনেকগুলো । সংস্হাগুলো এসে কাজের অর্ডার দিয়ে এবং পরে উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে যান । যা কিনা সুবাশ যে মূল্যে বিক্রয় করে; সে সকল সংস্হাসমূহের দোকানে তার মূল্য হয়ে যায় প্রায় দিগুনেরও বেশী । অর্থাৎ প্রকৃত লাভবান হন ঐ সকল সংস্হাসমূহ ।

পরিবারের সদস্য সম্পর্কে বলেন দু'সন্তানের জনক তিনি । কোন কণ্যা সন্তান তার হয়নি । পরিবারকে ছোট রেখেছেন । জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন। কিন্তু সুবাশের বাবার ছিলো চারজন সন্তান (ছেলে) কোন কণ্যা সন্তান নয় । কাজেই এক জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশন জন্মহার কমেছে বলেই মনে হয় । সুবাশের বাবাও ছিলেন তেমনি এক বড় পরিবারের সন্তান । এ যুগে এসে সুবাশ তাঁর পরিবারকে ছোট রেখেছেন । কারণ নিজের যে উপার্জন এর মধ্যে বেশী সন্তান নিয়ে পরিবার বড় করার কোন অর্থই নাকি তিনি খুঁজে পাননা । আর তাই প্রতিমাসে যে উপার্জন হয় তা দিয়ে দিব্যি পরিবার চলে যাচ্ছে ।

মরণ চাঁন পাল বাড়ি নং-৫৪, রায়ের বাজার । তাঁর বাড়ীর সাথেই রয়েছে একটি ছোট পূজার মন্ডপ । মাত্র কয়েকদিন আগেই/পূর্বেই সেখানে অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপূজা - হিন্দুদের সবচেয়ে বড় আনন্দ । রায়ের বাজারের কাটাসুর রাস্তা দিয়ে ছোট গলির ভেতরে ঢুকে হাতের বায়ে একটি ছোট লোহার গেট । মাত্র তিন টাকা রিকসা ভাড়া দিয়ে সুবাশ পালের বাড়ি থেকে এখানে এই গেটের সামনে পৌঁছান গেল । গেটটি বন্ধ ছিল তবে একজন অতিথি এসেছে ভেবে গেটটি খুলে দেয়া হ'লো । গেট থেকে ঢুকেই সরাসরি দেখা গেল মরণ চাঁন পাল কাজ করছেন - হুইল সংযুক্ত টেবিলের উপরে বসে ।

সুবাশ পালের ওখানে যা দেখা যায় তেমনি একজন বয়স্ক লোক তাঁকে হুইল ঘোড়াতে সাহায্য করছেন । তুলনামূলকভাবে বলা যায় সুবাশের হুইল সংযুক্ত টেবিলটি পুরোনো এবং উৎপাদনযোগ্য দ্রব্যটি ছিল এশ্টে, কিন্তু মরণ চাঁনের টেবিলটি রং করার ফলে নতুন এবং মজবুত আর উৎপাদনযোগ্য দ্রব্যটি হচ্ছে ফুলদানী । দিনটি ছিল ছুটির দিন - শুক্রবার । সুবাশ এবং মরণ চাঁন দু'জনই মন দিয়ে নিজের কাজ করছেন ছুটির দিন বলেই। কেননা অন্যান্য দিন তাদের দু'জনেরই কর্মক্ষেত্রে যেতে হয় - ফলে সেদিন কাজ করতে হয় কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে - বিকালে । তাই এক একটি ছুটির দিন যেন তাঁদের কাজের জন্য খুবই উপযোগী । অতিথি এসেছেন দেখে, তিনি একটি চেয়ার এনে দেয়ার জন্যে একজনকে বললেন । মরণ চাঁন পাল দেখতে কালো, মোটা এবং বেটে ধরনের । তবে তার মাঝে যে গুন লক্ষ্য করা যায় তাহ'ল তিনি সব সময়ই হাসি মুখে কথা বলেন । তিনি খুবই খোলামেলা প্রকৃতির বলে মনে হয়েছে । তাঁর এ কাজের ফাঁকে অন্য একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পাওয়া যায় অনেক রকমের মাটির দ্রব্য সামগ্রী, যা তৈরী হয়েছে বিক্রয়ের জন্যে । সেখানে অন্য এক যুবক মাটির কাজ করছিলেন । একটি মূর্তিসহ ওয়াল প্লেট তৈরী করছিলেন তিনি । যুবকটির কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানান যুবকটি তাঁর (মরণ চাঁনের) ইনষ্টিটিউট অব ফাইন আর্টস-এর শিক্ষার্থী এবং সাময়িকভাবে তাঁর বাড়িতে কাজ করে থাকেন । ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর প্রায় ৪০% উপার্জন যুবকটি পেয়ে থাকেন ।

মরণ চাঁন পাল ৩৫০টি মাটির ফুলদানীর অর্ডার নিয়ে কাজ করছিলেন । তিনি মূলত: মাটির ফুলদানী, পুতুল, মূর্তি, ফুলের ছোট টব, এশ্টে, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ওয়াল প্লেট প্রভৃতি সূক্ষ্ম হাতের কাজ করেন । সুবাশের মত মাটির পাতিল কিংবা কলস তিনি তৈরী করেন না । কাজ সম্মন্ধে তিনি বলেন পূর্বে তাঁর বাবা, দাদা সবাই এ কাজ করতেন বংশানুক্রমে । কিন্তু এ ধরনের ছোট ছোট সূক্ষ্ম কাজ তিনিই শুরু করেন । তাঁর বাবা তৈরী করতেন ফুলের টব । আধুনিককালে মাটির দ্রব্য/সামগ্রীর প্রতি চাহিদা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ফুলের টব বাদ দিয়ে তিনি এ ধরনের বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্ম কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন । কারণ কাজেও আনন্দ, চাহিদাও ভাল । যদিও সূক্ষ্ম কাজ খুবই কঠিন । তথাপিও তাঁর কাজ দ্রুত এগিয়েই চলছে চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে । অনেক সময় অর্ডার ফেরত দিতে হয় সময় না থাকার কারণে । মূলত: ১৯৬০ সালেই তিনি এ ধরনের কাজে ঝুঁকে পড়েন ।

তিনি জানান কাজের অর্ডার বেশী হলে তাঁর সাথে খন্ডকালীন কাজ করেন আরও কয়েকজন যুবক - যারা তারই শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, তিনি নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস্ এর মৃৎ শিল্প বিভাগের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন অনেকদিন ধরে। আর সে সুবাদে অনেক শিক্ষার্থী তাঁর বাড়িতে এসে কাজ করেন। তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেন ঐ আর্ট ইনস্টিটিউট থেকেই তিনি ডিপ্লোমা করেন এবং তখন থেকেই প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এর মাঝে কয়েকবার দিল্লী গিয়েছেন এবং এই মৃৎ শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন।

এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর কাজের মান আরও উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, এমন সব কাজ এখানে হচ্ছে যা দূর থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এটা মাটির তৈরী। তিনি বলেন মাটির কাজের কোন সামগ্রীই একবারে তৈরী করা যায় না। কয়েকটি স্তরে কাজ করতে হয়। যেমন করছেন সুবাশ পাল তেমনি। তবে কোন কোন দ্রব্য/সামগ্রীতে রং দিতে হয়। উৎপাদন সম্পর্কে বলেন তিনি সুবাশের মত যেমন চাহিদা তেমন উৎপাদন করতে পারেন না - তবে মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্ডার গ্রহণ করেন এবং সেভাবেই উৎপাদন করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার্থীদের সহযোগীতা পেয়ে থাকেন।

প্রতিমাসে উপার্জন সম্পর্কে তিনি বলেন, "বছরে এখানে ১-২ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয়ে থাকে। এ থেকে উৎপাদন কাজে সহযোগীতা যাঁরা করেন তাদেরকে দিতে হয় মোট উপার্জনের প্রায় ৩০%-৪০% অর্থ। এ ছাড়া তাঁর মাসিক ব্যয় উল্লেখ করেন এভাবে, গ্যাস বিল দিতে হয় ৩০০০-৩৫০০ টাকা, মিটার ভাড়া ৫০০ টাকা, প্রতিমাসে মাটি ক্রয় দুই গরুর গাড়ী (৩৫০X২)= ৭০০ টাকা, পানির বিল দিতে হয় ১৫০-২০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল ২০০-৩০০ টাকা প্রায়। নিজের বাড়িতেই থাকেন, তাই কোন বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না। এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে ব্যয়ের হিসাব। অর্থাৎ যদি বছরে ২ লক্ষ টাকায় সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহলে তার ৪০% (৮০,০০০) টাকা দিতে হয় সহযোগী উৎপাদকগণকে। অবশিষ্ট ১,২০,০০০ টাকা থেকেই প্রতিমাসের অন্যান্য ব্যয় মিটানোর পর যা নীট উপার্জন হিসেবে থাকে তা হচ্ছে প্রায় ৪০০০-৫০০০ টাকা মাত্র।

তাঁর উৎপাদিত এ সকল দ্রব্য সামগ্রীর ক্রেতা যেমন: কারিকা, কারুপন্য'র মত প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ। তিনিও সুবাশের মতই বলেন আমার (মরণ চাঁন পাল)

এখান থেকে দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় করা হয় প্রায় দ্বিগুন মূল্যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা তিনগুনেও রূপান্তরিত হয় । এ থেকে বোঝা যায় লাভবান যা হবার তা ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই হয়ে থাকে । প্রকৃত উৎপাদকগণ সঠিক লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হন বরাবর ।

এতো গেলো তাঁর ব্যবসায়ীক দিকের কথা । পারিবারিক প্রসংগ এলে তিনি বলেন পরিবারে বর্তমান সদস্য তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, দু'মেয়ে, এক ছেলেসহ মোট পাঁচজন । তিনি এমনও বলেন প্রথমে একটি মেয়ে এবং দ্বিতীয়টি ছেলে হলে হয়তো তৃতীয় সন্তান তিনি নিতেন না । তাই প্রথম দু'সন্তান মেয়ে হবার ফলে একটি ছেলে পাবার আশায় তৃতীয় সন্তানটি নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন । আসলে হয়েছেও তাই দু'মেয়ের পরে এক ছেলে । দু'মেয়েই বর্তমানে লেখাপড়া করছে এবং ছেলেও তাই । তাঁরা (সন্তানেরা) প্রয়োজনে তাঁকে (মরণ চাঁনকে) কাজে সহযোগীতা করে থাকেন । তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা ভবিষ্যতে একাজে আসবে । মরণ চাঁন পাল বলেন, "আমার সন্তানেরা এ পেশাতে কেও আসছে না তবে বংশের অন্য কেও তা গ্রহণ করলেও করতে পারে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এ শিল্পের বিলুপ্তি ঘটছে । তবে যা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে এ শিল্প হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে আসছে । দেখছেন না ! এখানে যে যুবকগণ কাজ করছে তারা সবাই মুসলমান পরিবারের সন্তান ।" এ কথা বলা যায় এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ে শিল্প হস্তান্তরিত হচ্ছে ।

মরণ চাঁন পাল তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার কথা বলতে যেয়ে বলেন পরিকল্পনাতো ছিল অনেক কিছুই করা, কিন্তু দেশের যে পারিপর্শ্বিক অবস্থা - তাছাড়া চাঁদাবাজরা তো আছেই । কোন কিছু করতে গেলেই নাকি তিনি চাঁদাবাজদের সম্মুখীন হন । অর্থাৎ কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই । আর তা নেই বলেই কোন পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না ।

প্রশ্ন :

ক) সুবাশ ও মরন চাঁনের এ শিল্পে সম্পৃক্ততায় তার বংশ কি ভূমিকা পালন করেছে? এটি এখন ক্ষয়িষ্ণু কেন ?

খ) সুবাশ ও মরন চাঁনের মৃৎশিল্পে বিসিক (BSCIC) কি ভূমিকা পালন করেছে ?

গ) সুবাশ ও মরন চাঁন যে শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে তাতে বাজার অর্থনীতি কি ভূমিকা পালন করেছে ?

হালিমার আশা *

শৈশবে বাবা মারা যাবার পর দুঃখ আর বেদনায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা হালিমা খাতুনের জীবন। বাবার সচ্ছল সংসারে অগাধ স্নেহে কোনদিন কল্পনা করতে পারেননি বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে স্বামীর সংসার পর্যন্ত বৃদ্ধা মা'কে সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে কঠিন জীবন সংগ্রামে। ভাবতেও পারেননি কোনদিন এক মুঠো অন্নের জন্য হাত পাততে হবে মানুষের দ্বারে দ্বারে, শুনতে হবে মানুষের ভর্ৎসনা। কিন্তু বিয়ের পর থেকে এই অভাবনীয় দুঃসহ জীবনযাত্রা শুরু।

ঢাকা ময়মনসিংহ রাস্তার দক্ষিণ পাশে বাধুটিয়া বাজারের আনুমানিক ৪ শত গজ পশ্চিমে হালিমা খাতুন থাকেন। একটি ছোট টিনের ছাপরা ঘর। এখানে মা, স্বামী ও পুত্র-কন্যা নিয়ে বসবাস করেন তিনি।

হালিমা খাতুন ঘর থেকে ছোট একটি আধ ভাঙ্গা জলচৌকি বের করে আমাকে বসতে দিলেন। বসেই তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্যের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তাঁর সাথে আলাপ জমালাম এবং বাড়ীঘরের অবস্থা দেখে নিলাম।

---

* ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস সম্পাদিত
বেলতৈল গ্রামের জরিমন, ও অন্যান্যরা
জীবন গবেষণা, ডিসেম্বর, ১৯৮২
নামক গবেষণামূলক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

আড়াই শতাংশ জমির উপর হালিমা খাতুনের বাড়ী। উত্তর পাশে ৯ হাত সাড়ে ৪ হাত একটি টিনের ছাপরা। চতুর্দিকে পাটখড়ি এবং গম গাছের ভাঙ্গা বেড়া। দক্ষিণ পাশে জীর্ণ একটি ছনের ছাপরা—যার চতুর্দিকে খোলা। আকাশ ভাল থাকলে এ ঘরে তাঁদের রান্নাবান্না চলে। ঘরের পশ্চিম পাশ দিয়ে লাউ-কুমড়া ইত্যাদির চালা। থাকার ঘরের এক কোণে ভাঙ্গা বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে তৈরী একটি উগার বা চাঙ্গানী। চাঙ্গানীর উপর ভাঙ্গাচোরা টিন কাঠ এবং পাট খড়িতে শুকানো কিছু গোবর যা রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্যে রাখা হয়েছে। তেলতেলে জীর্ণ কয়েকটি কাঁথা ও ছোট ছোট বালিশ। এক পাশে পাটের ছিকায় টানানো আছে কিছু মলিন কাঁথা এগুলির নীচে একটি বহুদিনের পুরানো ছেঁড়া লেপও আছে। পাটের ছিকায় টানানো আছে ছোট বড় কতগুলি শিশি বোতল, এক পাশে মাটির কলস ও বাটি, মেঝেয় পড়ে আছে ৪/৫টি মাটির বাসন, একটি এনামেলের পাতিল, একটি ভাঙ্গা পাটা ও কয়েকটি ছোট বড় মাটির চাঁড়ি। ঘরের পূর্ব উত্তর কোণে রশিতে টানানো আছে বহুদিনের পুরোনো টিনের একটি ছোট সুটকেস যেটি তাঁর বিয়ের স্মৃতি বহন করে। ঘরের আরেক কোণে বহু তালিযুক্ত ময়লা একটি মশারী জড়ো করে রাখা আছে। পাখা তৈরী করতে করতে হালিমা খাতুন তাঁর জীবনের সুখ দুঃখের ঘটনাবলী বর্ণনা করে চললেন।

আনুমানিক ১৯৫৪ সালে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ছনটিয়া গ্রামের ছোট একটি গৃহস্থ পরিবারে হালিমা খাতুনের জন্ম। তাঁর বাবারা ছিলেন ৩ ভাই। ৩ ভাইয়ের প্রায় ১৫/১৬ পাখী চাষের জমি ছিল। হালিমা খাতুনের জন্মের পূর্বেই তাঁর বাবা ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে যান। পৃথক হবার পর তাঁর বাবার ভাগে ৫ পাখীর কিছু বেশী জমি থাকে। হালিমা, বাবা-মা এবং বড় ভাই এই ছিল তাঁদের সংসার। দাদা-দাদী, নানা-নানীকে তিনি দেখেননি। পরিবারের লোক সংখ্যা অনুযায়ী যে জমিজমা ছিল তাতে তখনকার দিনে খুব ভাল ভাবেই সংসার চলতো। কোন সময় সংসারে অভাব অনটন অনুভব করেননি। বাবা এবং চার ভাই যথেষ্ট আদর স্নেহ করে হালিমা খাতুনকে লালন-পালন করেছেন। হালিমা খাতুনকে ৫ বছর বয়সের রেখে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেশ আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়েই হালিমা খাতুনের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে। বড় ভাই প্রাইমারী পর্যন্ত লেখা পড়া করেছিলেন, হালিমা খাতুন গ্রাম্য মক্তবে কোরআন পাঠ শিখেছেন। বাংলা শিক্ষা তাঁর ভাগ্যে জুটেনি। তাঁর মতে বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর জীবনেও শিক্ষার আলো জ্বলতো। মা এবং বড় ভাইয়ের সাথে সব সময় হালিমা খাতুনের ভাল সম্পর্ক ছিল। এ সময়ে মাকে গৃহস্থালীর কাজ-কর্মে তিনি সাহায্য করতেন। জমিজমার আয় দিয়েই সংসার চলতো। জিনিষ পত্রের দাম তখন বেশ কম ছিল। হালিমার মনে আছে ৫/৭ টাকা দিয়ে তখন একটি শাড়ী কাপড় কেনা যেতো। চৌদ্দ আনায় সোয়া সের চা'ল পাওয়া যেতো। বাবার জমির আয়ে চার জনের ছোট্ট সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেতো। বাবার মৃত্যুর পর সংসারে অমানিশার কালো মেঘ নেমে আসলো। হালিমা খাতুনের বাবা ছিলেন সবার বড় ভাই। বাবা জীবিত থাকাকালে জমি জমা নিয়ে চাচারা গণ্ডগোল করতে সাহস পেতেন না। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাইকে একা এবং দুর্বল পেয়ে চাচারা জমি জমা নিয়ে ঝগড়া বাধাতে লাগলেন। চাচারা কিন্তু কিছু জমিতে বেদখল দিলেন। তখন গ্রামের এক মহাজন তাঁর কাছে জমি বিক্রি করে দেয়ার জন্য ভাইকে পরামর্শ দিতেন। ভাই তাঁর পরামর্শ মত কিছু জমি বিক্রিও করে দিলেন। তখন থেকেই হালিমা খাতুনকে বিয়ে দেবার জন্য ভাই এবং মা চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

গায়ের রং কালো থাকার কারণে কোন ছেলেই হালিমা খাতুনকে বিয়ে করার জন্য এগিয়ে আসেনি। এ কারণে মা তখনকার দিনেও যৌতুক হিসেবে অনেক কিছু দিতে চাইলেও বর পাওয়া মুস্কিল হয়ে যায়। তাই হালিমা খাতুনের বিয়ে নিয়ে মা এবং বড় ভাইয়ের দুশ্চিন্তার অন্ত রইলো না। অবশেষে মা'র উদ্যোগে ধুনাইল গ্রামের আলাউদ্দীনের সাথে ১৩ বছর বয়সে হালিমা খাতুনের বিয়ে হয়। আলাউদ্দীনকে লোকে 'আলা পাগলা' বলে ডাকতো; আলাউদ্দীনের মাথায় গণ্ডগোল ছিল। বিয়েতে মা তাঁকে এক জোড়া শাখা দিয়েছিলেন। জামাইকে দিয়েছিলেন একটি জামা এবং একখানা লুঙ্গি। বিয়েতে ১০/১২ জন বরযাত্রী গিয়েছিলেন। মা এবং ভাই বেশ খরচ করে বরযাত্রীদের আপ্যায়ণ করে কনে তুলে দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দীনরা দুই ভাই। আলাউদ্দীন ছোট। ভিটাবাড়ী ছাড়া স্বামীর সংসারে ৫ শতকের মত চাষের জমি ছিল। হালিমা খাতুনের শ্বশুরের ৪/৫ পাখী জমি ছিল। কিন্তু তিনি পাগল ছিলেন। এবং জমি বিক্রি করে বসে বসে খেয়েছেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে হালিমা খাতুন পাননি। ভাশুর এবং দু'জন বিবাহিত ননাস ছিল, এঁদের সাথে হালিমা খাতুনের সম্পর্ক ভালই ছিল। স্বামী হাবা ধরনের থাকায় কাজ-কর্ম বেশী পেতেন না। বিয়ে করার পর আর একটা মানুষের দারিদ্র এবং সুখ দুঃখ তাঁর জীবনের সাথে জড়িত—এ সব বিষয়ে তাঁর মাথায় বেশি চিন্তা আসতো না। সংসার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন দারুণ উদাসীন। ফলে আস্তে আস্তে ভাইদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, যার পরিণতিতে দু'বছর পর ভাই তাঁকে পৃথক করে দিলেন। পৃথক হওয়ার পর স্বামী কিছু কিছু কাজ-কর্ম করা শুরু করলেন। হালিমা নিজে মানুষের বাড়ীর কাঁথা সেলাই করে এবং জাল বুনে সামান্য কিছু রোজগার করতেন, প্রতি কাঁথায় দু' টাকা মজুরী পেতেন। অধিকাংশ সময় স্বামী পেটে-ভাতে কামলা দিতেন। আড়াই শতক জমি ও ভিটাবাড়ীতে সামান্য আবাদ করতেন। এমনি করে কোন রকমে সংসার চলতো।

ইতোমধ্যে হালিমা খাতুনের বড় ভাই বিয়ে করে ঘর সংসার বাঁধলেন। কিন্তু মহাজনের খপ্পরে পরে আস্তে আস্তে জমিজমা বিক্রি করতে শুরু করেন। কাজ-কর্ম না করে বসে বসে খেয়ে অভাব-অনটন, টানাটানি ডেকে নিয়ে আসেন নিজের জন্য। এমনি অবস্থায় হালিমা খাতুনের মা জামাই বাড়ী এসে উঠলেন। স্বামী হাবা-পাগল এ কারণেও মা মেয়ের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। নানা কারণে স্বামীর সাথে মাঝে মধ্যে হালিমার ঝগড়া হতো। এতে ৩/৪ দিন কথা-বার্তা বন্ধ থাকতো কিন্তু তিনি জানেন, তাঁর স্বামী বোকা এবং পাগল তাই তিনি সব কিছু সহ্য করে যেতেন।

আলাদা হওয়ার কয়েক মাস পরই হালিমার প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো। তখন স্বামীর দিন মজুরীর আয় দিয়ে সংসার চলতো। সন্তান জন্মের ৫/৭ দিন পরই দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তানটি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সারা রাত শুধু কাঁদতো, সমস্ত শরীর ও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। এই অবস্থায় এক রাতে তাঁর নবজাতকটি মারা যায়। সন্তান মারা যাওয়ার পর হালিমার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়, পরে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে আবার কাজ কর্ম শুরু করেন।

এরপর একাত্তর সালে বর্তমান বড় মেয়ে মনোয়ারা বেগম জন্মগ্রহণ করে। এর তিন বছর পর দ্বিতীয় মেয়ে মরিয়ম এবং ৫ বছর পর ছোট ছেলে আবুল কাসেম জন্ম গ্রহণ করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হালিমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ ঐ সময়গুলোতে হালিমা নিজে কাজ করতে পারতেন না, স্বামীও তেমন কাজ কর্ম পেতেন না। তখন প্রায়ই তাঁকে আটা গুলে খেতে হয়েছে। তা'ছাড়া মা'ও পাড়ার বিভিন্ন বাড়ী থেকে কিছু খাদ্য-খাবার চেয়ে চিন্তে আনতেন, আবার অনেকে ইচ্ছা করে এটা ওটা কিছু দিলে তাই দিয়ে কোন মতে দিন চলে যেতো। অনেকদিন শুধু পানি খেয়েই থাকতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের একটি টুকরো স্মৃতি তাঁর মনে আছে। বিয়েতে তাঁর মার দেয়া শাখা জোড়া বিক্রি করে সখ করে একটি ভেড়া কিনেছিলেন হালিমা। ভেড়াটি যখন রাস্তার ধারে ঘাস খাচ্ছিল তখন রাজাকার বাহিনী সেটি নিয়ে গিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলে।

'৭৪-এর ভয়াবহ বন্যা ও দুর্ভিক্ষ তাঁর জীবনে ডেকে আনে আরো মর্মান্তিক দিন। ৭/৮ দিন না খেয়ে লতাপাতা, কচু সেদ্ধ খেয়ে জীবন বাঁচাতে হয়েছে। পেটের তাগিদে এসময় আড়াই শতাংশ আবাদী জমি বিক্রি করতে হয়েছে, তাতেও শেষ রক্ষা হলো না, বৃদ্ধা মা বাড়ী বাড়ী হেঁটে ভিক্ষে করেও খাবার যোগাড় করতে পারতেন না। ভিক্ষে করতে করতে মা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। এ সময় হালিমা দেখলেন আশেপাশের বাড়ীর অনেকে দেশ ছেড়ে দিনাজপুরে চলে যাচ্ছেন। অবশেষে তাঁরাও ভিটাবাড়ীখানা দুশো টাকার বিনিময়ে 'ভোগরাহান হিসাবে' অর্থাৎ যখন টাকা ফেরত দিতে পারবেন তখন ভিটাবাড়ী ফিরে পাবেন– এই শর্তে বন্ধক রেখে দিনাজপুরে চলে যান। ভাগ্যক্রমে দিনাজপুরের

দর্জি পাড়ায় গিয়ে বাবার দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের সন্ধান পান এবং তাঁর বাড়ীতে ওঠেন। জব্বর মুন্সী নামে ঐ ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁদেরকে বাড়ীতে ছোট একটি ঘর উঠিয়ে থাকতে দেন। এখানে থেকে তাঁর স্বামী মানুষের বাড়ীতে কামলা খাটতেন। দু'বেলা খাওয়াসহ ৫ টাকা মজুরী পেতেন। নিজে সূতা দিয়ে পাখা তৈরী করতেন। এক জোড়া পাখা বিক্রি হতো সোয়াসের চা'লে। এভাবে দিনাজপুরে মোটামুটি ভালভাবেই তাঁদের সংসার চলছিল। পরক্ষণেই তিনি দুঃখ করে বললেন "গরীবের ভাগ্যে এত সুখ সয় না।" কয়েক মাস পরেই হালিমা খাতুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এ অসুখে তিনি ৩ মাস ভোগেন। জ্বরে তাঁর বাম কান নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে দু'মেয়ের বা অন্য কারো না কারো জ্বর, সর্দি, আমাশয় ইত্যাদি অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকতো। তখন তাঁরা ভাবলেন দিনাজপুরে বসবাস তাঁদের জন্য মঙ্গল জনক হবে না। পাড়ার অন্যান্য লোকেরাও বললেন 'এ জায়গা তোমাদের সইবে না, তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও দেখবে অসুখ ভাল হয়ে যাবে।' অবশেষে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা '৭৫ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের দিকে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ফিরে এসে প্রথম তাঁদের পাশের বাড়ীর একটি শূন্য গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেন। এদিকে প্রতিবেশী মহাজন তাঁর ভিটাবাড়ী ফিরিয়ে দিতে রাজী হন না। পরে গ্রামের লোকজনের সহায়তায় ভিটাবাড়ী ফিরে পান এবং কাজকর্ম করে গহনাদি ও পাখা বিক্রি করে আস্তে আস্তে এক বছরে ভিটাবাড়ীর টাকা পরিশোধ করেন।

'৮০ সালের বন্যাও তাঁর পরিবারের উপর আঘাত হানে। বাড়ীঘরে পানি উঠে যায়। পানির জন্য বাইরে বের হওয়া এবং স্বামীর কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় তাঁর মা এবং তিনি ভিক্ষে করে চেয়ে এনে যা জোটাতে পারতেন তাই দিয়ে এক আধবেলা খেয়ে কোন মতে জীবন বাঁচিয়েছেন।

তাঁর মতে---গরীব থাকার কারণে পাড়াপ্রতিবেশীরা তাঁদেরকে ভাল চোখে দেখতো না। স্বামী বোকা হওয়ায় সবাই তাঁকে ঠকাতে চাইতো।

প্রতিবেশী কেউ একদিন কিছু সাহায্য করলে তা তাঁরা অন্তত: ১০ দিন বলে বেড়াতেন। এ কারণে অন্য গ্রামে গিয়ে সাহায্য চাইতেন তবু নিজ গ্রামে সহজে হাত পাততেন না। এক প্রতিবেশী বাড়ীর সীমানা নিয়ে ঝগড়া করে তাঁর স্বামীকে বেশ মারধর করেছিল। পরে গ্রাম্য সালিশিতে তা মিটমাট হয়ে যায়।

গরীব দেখে কেউ তাঁদেরকে ধার কর্জ দেন না, তবে কালিহাতী বাজারের এক দোকানদারের কাছ থেকে তিনি 'ইমিটেশনের' বিভিন্ন গহনা বাড়ীতে আনতেন। দোকানদারের এখনও একশ' পঁচাত্তুর টাকা পাওনা আছে, তাই তিনি প্রায়ই হালিমার বাড়ী এসে টাকার জন্য তাগাদা দেন। তাঁর মতে "একবার নিজে পুঁজি যোগাড় করতে পারলে আর বাকী জিনিস আনুম না, তাতে কেউ তাগাদা দিবোনা ব্যবসাতে লাভও বেশী অইবো।" হালিমা খাতুন এত গরীব যে মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার সাহসই তিনি পাননি। কারণ তিনি জানেন---মহাজনরা তাঁকে টাকা দেবেন না। তাঁর মতে---'মহাজনরা চড়া সুদ এবং বন্ধক ছাড়া টাকা দেয় না। কোন কিছু বন্ধকী রেখে সুদের উপর টাকা দেয়া এবং যে কোন প্রকারে সে টাকা সুদে আসলে আদায় করে নেয়াই তাদের চরিত্র'।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পে যোগ দেয়ার পূর্বে হালিমা খাতুনের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সংকটাপন্ন ছিল। স্বামী কাজ পেলে তাঁর সামান্য উপার্জন, মায়ের ভিক্ষার চা'ল এবং নিজে গ্রামে গ্রামে ফেরী করে যা কিছু পেতেন তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। অধিকাংশ সময়ই আটার জাউ রেঁধে দিনে একবেলা খেয়ে থাকতেন। রিলিফ, ফেতরার পয়সা কোরবানীর চামড়ার পয়সা ইত্যাদি দান-দক্ষিণা দিয়ে মাঝে মাঝে নিজের এবং পরিবারের অন্যান্যদের জামা কাপড় কিনতেন। গরীব হবার কারণে সামাজিক কোন মর্যাদা আগেও ছিলনা এখনো নেই।

একদিন পাশের গ্রামে ফেরী করে বাড়ী ফেরার সময় ধুনাইল গ্রামের কেন্দ্রপ্রধান ইয়াসমীন তাঁকে ডেকে বসালেন। কেন্দ্রপ্রধান তাঁকে বললেন—'তুমিতো দোকানদারের নিকট থেকে বাকী জিনিস এনে গ্রামে

গ্রামে ঘুরে বিক্রি কর, বাঘুটিয়া বাজারে গ্রামীণ ব্যাংক এসেছে, ভূমি-হীনদের লোন দেয়—সেখান থেকে তোমাকে লোন এনে দিই, তুমি ভাল করে ব্যবসা কর। হালিমা মনে মনে চিন্তা করলেন—'গরীবদের আবার টাকা দেবে কে? যদি কিছু টাকা দিত তবে তো ব্যবসাটা ভালভাবেই করা যেতো।' বাড়ী এসে তিনি মা'র সাথে আলাপ করলেন।

স্বামী এ বিষয়ে ভালমন্দ কিছুই বলতে পারবেন না বলে হালিমা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর মা একে ভাল মনে করে হালিমাকে বললেন ইয়াসমীনকে টাকার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য ভাল করে অনুরোধ করতে। ২/৩ দিন পর হালিমা আবার ইয়াস-মীনের বাড়ী গেলেন এবং তাঁকে লোন পাবার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ইয়াসমীন তাঁকে গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়ম-কানুন বুঝালেন এবং তারপর থেকে গ্রুপ গঠন করার জন্য হালিমা উঠে পরে লেগে যান। কিন্তু যাঁর কাছেই যান কেউ তাঁকে গ্রুপে নিতে চান না, সবাই এড়িয়ে যান। বলে 'তুই ট্যাকা পয়সা দিতে হারবি না হ্যাসে আমাগোর বিপদ ডাইকা আনবি। তোরে গ্রুপে নেয়া যাইবো না।' এইভাবে ১০/১২ দিন ঘুরাঘুরির পর কেন্দ্রপ্রধান ইয়াসমীন নিজে তাঁর টাকার জামিন হলেন। কেন্দ্রপ্রধান সকলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন—"হালিমা যদি টাকা দিতে না পারে তবে কিস্তি আমি নিজে পরিশোধ করুম।' কেন্দ্রপ্রধানের প্রতি-শ্রুতির পর গ্রুপ করার প্রস্তুতি চল্‌লো। ইয়াসমীনের বাড়ীতে ৭ দিন ক্রমাগত মিটিং হলো এবং ৫ টাকা করে ৭ দিনের পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয় জমা করলেন। অবশেষে ব্যাংকের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী গ্রুপ স্বীকৃতি পেয়ে প্রথম ২ জন টাকা পেলেন, তার ১৫/২০ দিন পর কেন্দ্র মিটিং-এ হালিমা খাতুনের নামে দুশ' পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হলো। ১২/১৪ দিন পর হালিমা খাতুন প্রথম দফার দুশ' পঞ্চাশ টাকা ঋণ পেলেন।

গ্রুপ গঠনের পরও তাঁর গ্রুপের অন্যান্যরা যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। সবার মনে তখনও সন্দেহ—হালিমা কিস্তি দিতে পারবেন কিনা।

যে দুইজন তাঁকে গ্রুপে নেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী বাধা দিয়েছিলেন, তারা টাকা পায় হালিমা খাতুনের পরে; তাই তারা বলেন-'অরে আমরা নিতে চাইলাম না ও-ই প্রথম টেকা পাইল।'

টাকা পাওয়ায় তাঁর পরিবারের সকলে বেশ খুশী হয়েছিল। তাঁদের মনে হল---'আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত নাজিল করেছে।' হালিমা মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন—যেভাবেই পারেন তিনি নিয়মিত টাকা পরিশোধ করবেন। টাকা পাওয়ার পর পরই তিনি বিলবর্নী গ্রামের কালু বেপারীর কাছ থেকে একশ' পঞ্চাশ টাকার গহনাদি (যেমন কাঁচের চুড়ি, কানের দুল, হাতের চুড়ি, ফিতা ইত্যাদি) কিনে আনেন। পাশের ইউনিয়নের ইদুপুর গ্রাম থেকে একশ' টাকার সুতা এবং বাঁশ কিনে আনেন।

এ সকল গহনার দ্রব্যাদি এবং পাখা তৈরী করে তিনি পুগলী, আউলটিয়া, বাংড়া, ঝাটিবাড়ী, মুলিয়া ইত্যাদি গ্রামে হেঁটে হেঁটে বিক্রি করেন। তাঁর মা আর এখন বাড়ী বাড়ী হাত না পেতে হালিমার কাজে সাহায্য করেন। গহনার দ্রব্যাদি বিক্রি করে যা আয় হয় তা দিয়ে চা'ল, আটা ইত্যাদি কিনে দৈনিক খাবার খরচ চালান। পাখা বিক্রির আয় থেকে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। গ্রুপের অন্যান্য সদস্যাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল। তাঁর মতে "নিজে যদি ভাল থাহি অন্যেরা খারাপ কইবো কেন?"

কেন্দ্রের সব সভাতেই তিনি উপস্থিত থাকেন। তবে যেহেতু তিনি গ্রামে গ্রামে ফেরী করে জিনিসপত্র বিক্রি করেন তাই মাঝে মধ্যে সভার পূর্বে কেন্দ্র প্রধানের নিকট টাকা পয়সা জমা দিয়ে ফেরী করতে চলে যান। পাখা বিক্রির মাধ্যমেই তিনি প্রথম দফার টাকা পরিশোধ করেছেন। প্রথম দফার টাকা পরিশোধ করার পর তাঁর মনে সাহস জন্মালো আরো বেশী টাকা পেলেও তিনি শোধ করতে পারবেন।

তিনি দ্বিতীয় দফা ঋণের জন্য ব্যাংকের নিয়ম মাফিক আবেদন করেন এবং পাঁচশ' টাকা পান। দ্বিতীয় দফা ঋণের দুশ' বিশ টাকা

শোধ হয়ে গেছে। তাঁর আশা শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে যথাসময়ে বাকী টাকাও শোধ করবেন। তৃতীয়বার যাতে এক হাজার টাকা পান এ জন্য আমি যেন ঢাকার সাহেবদের বলি---এটি তাঁর বিশেষ অনুরোধ।

আয়-ব্যয় লাভ-লোকশানের কথা জিজ্ঞেস করতেই হালিমা খাতুন বললেন—"স্যার লিখতে লিখতে খাতা ভইরা ফেলাইলেন গরীব মাইন-ষ্যের কথা এগুলি দিয়া আর কি অইবো, আমরা কি আর অত হিসাব নিকাশ জানি, আর অত হিসাব কইরা পারিও না। দৈনিক মাল বিক্রি কইরা ১০/১৫ ট্যাকা পাই, তার থেকে জিনিসের দাম বাদ দিলে ৪/৫ ট্যাকা থাহে। তা দিয়া চাইল, আডা কেনার পয়সাই অয় না। দিনে এক বেলায়ই সোয়া সের চাইল লাগে। হেই পয়সা যোগাড় করতে পারি না।"

৩ দিনে ২টি পাখা তৈরী করা যায়। প্রতিটি পাখায় ২·৫০ থেকে ৩ টাকার মত খরচ পরে। বিক্রি হয় প্রতিটি ৫ টাকা। প্রতিদিন বিক্রি হয় না। পাখা বিক্রির টাকা থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি ও সঞ্চয়ের মোট ১১ টাকা পরিশোধ করেন। এভাবে এখন তাঁর সংসার চলছে।

হালিমা খাতুনের ২ মেয়ে সারাদিন বাড়ীতেই থাকে। ছোট ছেলে আবুল কাসেমকে নিয়ে হালিমা খাতুন ফেরী করতে যান। আগের দিনের যা থাকে তা দিয়ে সকাল বেলা নিজে এবং পরিবারের অন্যান্যরা খেয়ে নেন। বিকেলে ফেরী করে ফেরার সময় সামান্য চা'ল আটা যাই যোগাড় করতে পারেন তাই নিয়ে এসে রান্না-বান্না করে সবাই মিলে রাতের বেলা খান। তিনি বলেন---'আমার ছেলেমেয়েরা বেশ শান্ত। যা যোগাড় করে দিই তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে।' মাঝে মাঝে ফেরী করে ফেরার পথে ছোট ছেলেটিকে বিস্কুট বা লজেন্স কিনে দেন। সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এখনো কোন চিন্তা করেননি। তাঁর মতে 'খাওয়ার যোগাড় করতে পারিনা আবার লেখাপড়া।' চা'ল এবং আটা ছাড়া হালিমা খাতুনের খাবার জন্য অন্য কোন জিনিস কিনতে হয় না। ফেরী করতে গিয়ে লাউ, কুমড়া, শাক-পাতা মানুষের বাড়ী থেকে চেয়ে আনেন তা দিয়ে কোন রকমে খান। স্বামী মাঝে মধ্যে মাছ ধরে আনেন। ২টি হাঁস ছাড়া তাঁর অন্য কোন গৃহপালিত প্রাণী নেই। গত এক বছরে লাভের টাকায়

তিনি কোন জিনিস-পত্র ক্রয় করেননি। তবে গ্রামীণ ব্যাংকের গত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি ২০/২৫টি পাখা বিক্রি করেছিলেন। পাখা বিক্রির কিছু টাকা এবং ফেতরার পয়সা মিলিয়ে ষাট টাকা দিয়ে একখানা শাড়ী কিনেছিলেন।

পরিবার পরিকল্পনাকে তিনি পছন্দ করেন না। পরিবার কল্যাণ কর্মী কমলা খাতুন অপারেশনের জন্য দু'দিন তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন কিন্তু তিনি রাজী হননি। তিনি বলেন, 'অপারেশন করে অসুখ হয়ে পড়লে সকলের না খেয়ে মরতে হবে। আল্লাহ মানুষ দিলে রিজিকও দিবেন।'

ব্যাংকের টাকার উপার্জনে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন—'আগে পয়সা জমাই—পরে পরিকল্পনা।'

গত এক সপ্তাহে তাঁদের খাবার-দাবারের তালিকা

বার ও তারিখ	সকাল	রাত
১৮-৮-৮১ মঙ্গলবার	আটার জাউ	ভাত, কচু ভর্তা
১৭-৮-৮১ সোমবার	আটার রুটি	মুড়ি
১৬-৮-৮১ রোববার	ভাত, শাকপাতা	ভাত, শাকপাতা
১৫-৮-৮১ শনিবার	শুধু পানি আর এক মুঠা খুদ ভাজা	সামান্য মুড়ি
১৪-৮-৮১ শুক্রবার	আটার জাউ মরিচপোড়া	আটার জাউ মরিচ পোড়া
১৩-৮-৮১ বৃহস্পতিবার	ভাত, কুমড়া	ঠাণ্ডা ভাত কুমড়া
১২-৮-৮১ বুধবার	আটার জাউ	আটার রুটি কুমড়া

হালিমা খাতুন আশা করেন ব্যাংকের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে তাঁর জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবেন।

প্রশ্ন :

১) ১৩ বছর বয়সে হালিমার বিয়ের পেছনে কিসের প্রভাব রয়েছে ?

২) হালিমা ময়মনসিংহ থেকে দিনাজপুরে এসে জব্বর মুন্সীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয় কেন ?

৩) হালিমার জীবনের সচ্ছলতার পেছনে গ্রামীন ব্যাংকের কি ভূমিকা কাজ করেছে?

It will take more than government intervention to change age-old attitudes toward the lower castes in India

The Stigma of the Caste System

BY WILLIAM DALRYMPLE

LAXMI CHAND TYAGI stood holding a flashlight in the wreckage of his rural development center about 30 miles from Jodhpur in northwestern India. "They were around 400 high-caste youths, mostly Rajputs, from neighboring villages," he explained as we stumbled in the dark, past the charred window frames and shattered doorways. "They poured over the compound wall, swinging iron bars and *lathis* (wooden staffs). Then they shouted, 'Who is from the low castes?' And if they saw anyone with dark skin, they beat them with their iron bars. They set on fire everything that was here: the cots, the clothes, the mattresses. They threw onto the blaze the center's records and video recorders

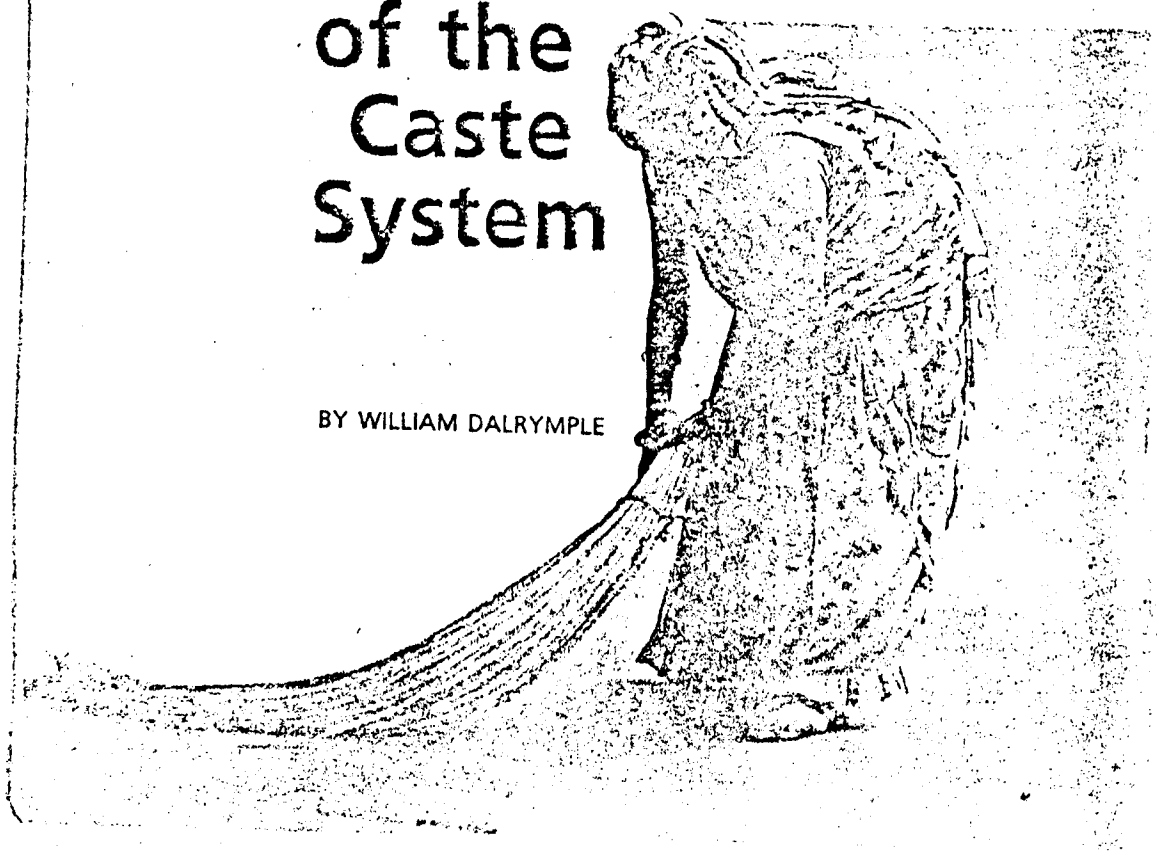

and the slide projectors – everything we had built up over seven years."

Tyagi spoke quietly on that morning of October 22, 1990. He is a small, precise man, with hunched shoulders, a rumor of a mustache and heavy black-rimmed glasses perched uncomfortably on his nose. "Here, look!" he said. "This was the dispensary." The torch beam swept around a small rectangular cell, whose door was hanging loose on its hinges. As we stepped inside, our feet crunched on broken glass, pills and capsules. "The Harijan (untouchables) used to come nearly 25 miles for treatment here. And we taught them rudimentary health care."

"But why did they do this?" I asked. "What difference does it make to the Rajputs if you educate the untouchables?"

"The lower castes have always been the slaves of the higher castes," he replied. "They work in their fields for low wages; they sweep their streets. If we educate them, who will do these dirty jobs? The Rajputs hate this place because it makes their slaves free."

When I asked Tyagi what he had done while the Rajputs destroyed his life's work, he made a slight gesture with his open palm: "I was thinking of Gandhi. He was also beaten up -- many times. He said you must welcome such attacks because it is only through confrontation that you can go forward. We will start again. The poor of this desert still need us."

"And if the higher castes come for you again?"

"Then we will welcome them. They are also victims of their culture."

While driving to the center, Tyagi had shown me just how far caste is written into the Indian landscape. Coming over a ridge, we saw a small white-stone village. Nearby stood another, larger settlement: a series of round mud huts with pretty conical thatched roofs. To me it was a charming picture, but to Tyagi it spoke of repression and segregation. "The stone village with the *pukka* houses belongs to Rajputs," he explained. "The huts belong to the Harijan. They are not allowed to live together, and if a Harijan wishes to come past the Rajput houses, he must remove his shoes."

"Do the castes have separate wells?"

"No, there is only one well. If a woman from a Harijan family wishes to take water from it, a person of high caste must come and provide it. The untouchable cannot touch the bucket. It is the same in every sphere of life. In the village tea house, the cups for the Harijan are kept separately from those of the other castes. If there is a public meeting, the Harijan cannot share the same *durree* (carpet) or *charpoy* (string bed) as the Rajputs. If Harijan children are admitted to the primary school, then

they sit separately at the back."

In Rajasthan, caste is an open book that can be read as soon as you know the local visual dialect. Among men it is the color and tying of the turban that is significant: around Jodhpur, a white turban belongs to an elderly smallholder of the middle castes (the Bishnoi or the Jats), while only the upper castes will wear saffron. The way you train your mustache – upward, downward or across – and the way you wear your *dhoti* (loincloth) could define you even more closely.

Among women, jewelry and dress color is important. Saffron, yellow and red are the colors of the upper castes and are worn with elaborate and expensive jewelry. Red with black borders and maroon are usually worn by the middle castes, while darker colors, coarse cloth, simple silver or brass anklets and tattooed arms define the wearer as low caste – or an untouchable.

From marriage to jobs, every detail of life in the traditional Indian village, where 75 percent of Indians still live, is regulated. Everyone knows his place, and what is expected of him. Moreover, it is divinely ordained. Hindus believe that your caste in this life is determined by your actions in a previous existence. A good life is rewarded by high caste, a bad life punished by future low-caste status or even untouchability.

Therefore, to rise out of your caste within your present lifetime does more than just rock the foundations of society: it breaks the cosmic cycle; it defies nature. So when a man tries to educate the Harijan, he must be stopped. And when a government commits itself to raising the status of the lower castes, that too must be fought.

Rajeev Goswami was a Brahmin boy, in his early 20s, from a middle-class Punjabi family. His father was a postal clerk, and in time Rajeev was expected to take up a respectable government job as well. The government's announcement on August 7, 1990, that 27 percent of those jobs were to be reserved for backward castes (adding to the 22.5 percent already reserved for certain very low castes and tribal people) ended Rajeev's hopes of a career in the bureaucracy. Previously, the better clerical jobs had been the preserve of the Brahmins. That many of these should now be reserved for the lower castes was unthinkable.

First Rajeev went on a hunger strike, but it received little attention in the press. So, together with some friends, he planned a stunt – a mock self-immolation. He would douse his legs with kerosene and set them alight. His friends would be on hand to put out the fire.

On that morning of September 19, 1990, Rajeev was at the venue with only his legs doused in kerosene. But in the charged atmosphere he got carried away. He poured kerosene over his body and set himself alight. His friends, who were at the

back of the crowd, couldn't put out the flames. But there were photographers, and as Rajeev burned, the shutters clicked. The next morning, while Rajeev fought for his life in hospital, his picture was on every front page.

In quick succession, riots broke out in several Indian cities as high-caste students fought police, disrupted traffic and burned trains. There was a wave of self-immolations – deliberate this time, and all involving high-caste teen-agers.

The state of Rajasthan, where Jodhpur is located, was one of the centers of the agitation. Here centuries of rule by Rajputs had left a monolithic legacy of caste distinctions. Social mobility was virtually unknown. Thus, when the new government measures were announced, the shock here was considerable. The attack on Tyagi's center was just one among many attacks on the lower castes.

When I went to Rajasthan after the riots began, the violence had subsided, but emotions were still running high. In Jodhpur I found an angry group of high-caste students waving black flags and clustered round a makeshift shrine – a picture of the burning Rajeev Goswami and a statue of the Monkey God Hanuman ("to give us strength to fight the government"). "In old times these untouchables were oppressed, but today nothing," said Sandeep Joshi, a student leader. He shook his head with horror: "If they get government jobs, everything will break down." The lower castes had the same opportunities as anyone else, the students argued, and if many of them were poor, then so were many Brahmins.

This is partly true. Even in Rajasthan some untouchables are doing well. Forty miles outside Jodhpur, in the village of Gadvada, lives a large community of leather workers, one of the lowest sub-castes of untouchables. For years they had pursued the uncertain trade of stitching together leather shoes. But recently a Delhi businessman gave them new designs and employed nine stitchers to make high-quality leather goods. The stitchers now earned about 25 rupees a day, two-thirds more than the 15 rupees the upper castes paid day laborers in their fields. As the stitchers worked in pairs, usually with another family member, it was possible for one family to bring home 2000 rupees a month.

In India this is big money, and in Gadvada the prosperity was showing. Several of the leather workers had built additional rooms to their homes, and a few had even bought stainless steel kitchen utensils. Socially, they were still untouchable. However, several of them had now leased farmland to the middle castes.

But Gadvada is exceptional, whereas the village of Gagadi, where Tyagi has his center, is typical. Home to about 300 families from eight different castes, its

social hierarchy is rigid. Rajputs and Brahmins are at the top, Jats in the middle. Below them are three low castes – the basketmakers, potmakers and blacksmiths – and finally the untouchable castes – leather workers and sweepers.

Caste feelings here remain strong. Bhera Ram is a charming Jat. Tall and well-dressed, he is the manager of the farmers' local cooperative. When I asked him about the plan to reserve government jobs, he said, "It will break down the existing social order – this mustn't happen!"

"You think they should be your servants?" I asked.

"The lower castes," he said, "must respect us and know their place."

"And do they no longer respect you?"

"The educated ones now look for other jobs. They don't want to work for me."

"Would you let a low caste come into your house?"

"If he tried, I'd berate him and throw him out," said Bhera Ram.

In the end, only time and education can hope to remove the stigma of the caste system. Just before I left Gagadi, I talked to Nim Bhara, a 12-year-old boy who goes to the school run by Tyagi. "Are there untouchables in your class?" I asked.

"Yes, but we all sit together."

"Are you friendly with them?"

"Yes, in school I can mix freely with them."

"When you grow up and have a house of your own, will you treat everyone the same?"

Nim Bhara remained silent for a while. Then softly he said, "Yes."

CONDENSED FROM OBSERVER MAGAZINE (DECEMBER 2, '90). © 1990 BY OBSERVER MAGAZINE, LONDON.
PHOTO © TIM GIBSON/ENVISION

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নারায়নগঞ্জ শহর থেকে গোগনগর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে যাবার সড়ক পথের প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগই মেঠো পথ এবং বাকীটুকু পাকা । এর মধ্যে আবার একটি ছোট কাঠের সেতুও রয়েছে । প্রাথমিক শিক্ষালয়ের প্রধান ফটকটির একটি অংশ খোলা থাকে সব সময় যাতায়াতের সুবিধার জন্য । সে ফটক দিয়ে যে প্রথম কক্ষটি সামনে পরে তা শিক্ষকদের কক্ষ । সেদিন ২টার সময় কক্ষটিতে চারজন মহিলা শিক্ষিকা এবং দু'জন পুরুষ শিক্ষক কথা বলছিলেন ।

নারায়নগঞ্জ সদর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২-০৪-৯২ তারিখে

দ্বিতীয় সভা " ২৫-০৫-৯২ "

তৃতীয় সভা " ২২-০৯-৯২ "

চতুর্থ সভা " ২২-১০-৯২ "

এ তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম, পদবী, সবাক্ষর রয়েছে, যেখানে কখনও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতে পারেননি । অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সে কমিটির চেয়ারম্যান, যাকে - এ সভায় সভাপতিত্ব করার কথা । এ তথ্য সংগ্রহ করা হয় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর থেকে । উল্লেখিত সময়ে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে ওয়ার্ড ভিত্তিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য সংগৃহীত নেই ।

নারায়নগঞ্জ সদর থানার গোগনগর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে কেবলমাত্র একটিই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে । এ বিদ্যালয়ের একজন পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষক জানান, সরকার "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা" একটি আইন করেছেন বটে, কিন্তু এখনই এ আইনে সবাইকে বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে ভর্তি করা সম্ভব নয় । কেননা সে এলাকায় অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই করুণ । এক্ষেত্রে তাদের ৬-১০ বছর বয়সের শিশুগণ উপার্জনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে; কাজেই কোন অভিভাবকই তাদের সন্তানকে এ উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে না বা করতে চায় না । যেমন- এ এলাকাতে লক্ষ্যনীয় যে, শিশুরা পাটের গুদামে কাজ করছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে

হোসিয়ারী শিল্পে কাজ করছে । এদের দৈনন্দিন উপার্জন ২০-৩০ টাকা হলেও তা পরিবারকে অনেকটা সাহায্য করে থাকে । বিদ্যালয়ের শিশুদের খেলাধুলা বা বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই । নেই টিফিনের ব্যবস্থা । কাজেই কেন অভিভাবকগণ তাদের উপার্জন বাদ দিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন ?

<u>প্রশ্ন</u> :

ক) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন একটি রাজনৈতিক অংগীকার তা সত্ত্বেও ঘটনা-সমীক্ষায় চারটি সভাতেই সভাপতি মহোদয় অনুপস্থিত ছিলেন - এর কারণ কি বলে মনে হয় ?

খ) এ সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় (৬-১০) বছর বয়সের শিশু শিশু শ্রমে নিয়োজিত । শিশু শ্রমের পেছনে কি কারণ আছে বলে মনে হয় ?

ঘটনা-সমীক্ষার বিশ্লেষণ

যে কয়েকটি ঘটনা-সমীক্ষা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে তা পাঠ করে আমরা কি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি ? পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনাগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে কি আমরা এমন কোন নির্দেশনা পাই যা আলাউদ্দিন, মিজান বা সুবাশকে লক্ষ্য করে করা হয়েছিল ? সমষ্টিক পরিকল্পনায় এদের কথা কি বিবেচনায় আনা হয়েছিল ? যে কোন সমষ্টিক পরিকল্পনাতেই কিছু না কিছু চুঁইয়ে পড়া (Trickle Down) বা Externalities (বাহ্যতা) এর প্রভাব থাকে ।

আমাদের এ যাবত প্রণীত ও বাস্তবায়িত পরিকল্পনাগুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সাথে এমনভাবে বিক্রিয়া করেছে বলে মনে হয় যে, সমাজ কাঠামোর নিম্নস্তরের মানুষেরা সরাসরি উপকৃত না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা এ ঘটনা-সমীক্ষার মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে । আলাউদ্দিন কি প্রক্রিয়ায় একটি মোটর ওয়ার্কসপের মালিক হতে পারলো ? মিজান কি প্রক্রিয়ায় একটি অনানুষ্ঠানিক বাজারের (Informal Market) বিক্রেতা বা দোকানী হতে পারলো ? বিশ্লেষণ করলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ব্যক্তিক পর্যায়ে সদ্উদ্যোগে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করা হয়েছে । এখানে ব্যক্তিক বা একক ভূমিকাই মুখ্য ছিল বলে মনে হয় । একই সাথে জ্ঞাতি সম্পর্ক (Kinship) একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল । আলাউদ্দিন তাই ঢাকার অনিশ্চয়তার মধ্যে এসে তাঁর চাঁচার বাসায় ঠাঁই নেয় । প্রথম পর্যায়ে মিজানকে তাঁর চাচাত ভাই সাহায্য করেছে । সুবাশ তাঁর বংশের ধারা (মৃৎ শিল্প) বজায় রেখে চলেছে। এ সবগুলো ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে সমষ্টিক অর্থনীতি একটি ভূমিকা পালন করে চলেছে ।

সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে জনসংখ্যা বেড়েছে, চাহিদা বেড়েছে, বিদেশের সাথে যোগাযোগ বেড়েছে । ফলে নতুন প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । তাই আলাউদ্দিন মোটর মেকানিকের কাজ নিয়েছিল । সুবাশ তার বাবার ফুলের টব ছেড়ে আধুনিক রুচিসম্মত শিল্পকর্মে নিয়োজিত হয়েছে । এ দু'টি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং বিসিক (BSCIC) এর ভূমিকা লক্ষ্যনীয় ।

ঘটনা সমীক্ষাগুলোতে যে সামাজিক সচলতা (Social Mobility) লক্ষ্য করা গেল, তাতে বাংলাদেশের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের কি কোন ভূমিকা রয়েছে ? আমরা জানি আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ অত্যন্ত প্রকট ছিল; এখানে Community Organisation বা জনসমষ্টি সংগঠন শক্তভাবে গড়ে উঠেনি, সম্ভবত ভৌগোলিক ও কৃষি পণ্য সহজে উৎপাদন হওয়ার সুযোগ থাকার কারণে ।

জনসমষ্টি (Community) চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলন কখনই দানা বেঁধে উঠেনি । আখতার হামিদ খান ষাটের দশকে কুমিল্লায় যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে সফলতা লাভ করতে পারেনি বা এর বিস্তার সঠিকভাবে হয়নি । কিন্তু গ্রামীন ব্যাংক বেশ কিছুটা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে । গ্রামীন ব্যাংক এর দর্শনগত ধারণা কিন্তু সমবায় ভিত্তিক নয়; বরং এর উল্টোটি - ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ । যদিও ক্ষুদ্র একটি দলের সদস্য হিসেবে একজন ভূমিহীন কৃষক গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ নিয়ে এককভাবে কাজ করে । এখানে এককভাবে কাজ করাটাই মুখ্য ।

ভারতের রাজস্থানে বর্ণপ্রথায় সাম্প্রদায়িক চেতনা এতই শক্ত যে একজন হরিজনকে ইদারা থেকে পানি সংগ্রহ করতে হলে একজন ব্রাহ্মন এর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়; হরিজনের জন্য পৃথক ইদারা নির্মাণের কোন অবকাশ নেই । ইদারাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সে সমগ্র সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । সমষ্টিক পরিকল্পনায় কিছু ছিঁটে-ফোঁটা প্রভাব এই হরিজনদের মধ্যেও এসেছে । তাই যোধপুরের কাছে চর্মকাররা বাজার অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে । এর ফল সাম্প্রদায়িক সচলতার (Social Mobility) ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী হতে পারে ।

বাংলাদেশের মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হতে পারে । প্রয়োজন, আমাদের সকল পরিকল্পনায় এটিকে যথাযথভাবে বিবেচনায় আনা ।

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া - একটি ঘটনা সমীক্ষা

কোন দেশের সমাজ কাঠামোর সংগে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা খতিয়ে দেখা বা সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো এ ঘটনা সমীক্ষার উদ্দেশ্য । বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা "ছয়টি" সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কেন গ্রামীন ব্যাংক ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে এবং কেন কুমিল্লা সমবায় সফলতা লাভ করতে পারেনি ? এই সফলতায় বাংলাদেশের সনাতনএবাদ কি ভূমিকা রেখেছি ? অথবা বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দারিদ্র কি ভূমিকা রাখছে ? এর সংগে সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক কি ?

সমীক্ষার উদ্দেশ্য :

(ক) কেন্দ্রের তিনটি ক্যারিয়ার কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা;

(খ) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে বিশ্লেষণ করার টেকনিক সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা;

(গ) উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা ।

সমীক্ষার সুফল :

(ক) এই ঘটনা-সমীক্ষা থেকে সমাজ কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়নের যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান তা সুস্পষ্টভাবে প্রমান করা যাবে;

(খ) এই নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এই বিষয়টি এতদিন আলাদাভাবে কোথাও দেখান হয়নি । এ প্রচেষ্টা নেয়া হবে;

(গ) এই নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ সহজতর হবে, ফলে সমস্যার জট খোলা সম্ভব হবে;

(ঘ) বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বাস্তবভিত্তিক নীতি প্রণয়ন ও কর্ম-পরিকল্পণা বাস্তবায়ন সহজতর হবে ।

সমীক্ষার যৌক্তিকতা :

ধারণা করা হয়েছে যে, পরিকল্পিত উন্নয়ন করলেই উন্নয়নের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব । কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি । বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ

করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেল যে উন্নয়ন সঠিকভাবে বা সঠিক পথে হয়নি । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, দারিদ্র বেড়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে ইত্যাদি । এই সমীক্ষার মাধ্যমে উন্নয়নে সমাজ কাঠামো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

সমীক্ষার পরিধি :

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া এই ঘটনা সমীক্ষার মূল বিষয়বস্তু । এই মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামাজিক বিবর্তনসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের যে বর্তমান সম্পর্ক তা'ও বিশ্লেষণ করতে হবে । সমাজ কাঠামো এবং উন্নয়নকে কেন্দ্র করে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । এ ছাড়া সমীক্ষায় নিম্নলিখিত সাতটি/ছয়টি *ঘটনা-সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে :

ক) জনসংখ্যা বিশ্লেষণ

খ) প্রযুক্তি হস্তান্তর

গ) Urban Informal Sector/Market (নগরের অনানুষ্ঠানিক বাজার)

ঘ) গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো

ঙ) বাংগালীর স্বাতন্ত্রবাদ

চ) প্রাথমিক শিক্ষা

ছ) স্থানীয় সরকার (Local Government)

* তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঘটনা-সমীক্ষার বিষয় পরিবর্তিত হতে পারে ।

সমীক্ষার পদ্ধতি:

এই সমীক্ষায় প্রাথমিক/মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে । বিভিন্ন দলিল, বই-পত্র, পুস্তক, পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে ।

Objectives of the Plan (The First Five Year Plan 1973-78)

Objectives of the Plan :

(i) To reduce poverty.

(ii) To raise output in the major sectors of the economy particularly in agriculture and industry.

(iii) To expand the output of essential consumption items like food, clothing, edible oil, kerosene and sugar with a view to provide the minimum consumption requirements of the masses.

(iv) To consolidate the gains made so far in the socialist transformation of Bangladesh; to ensure a wider diffusion of economic opportunities in the self-employment sectors in the urban and rural areas.

(v) To reduce dependence on foreign aid over time through mobilisation to domestic resources and the promotion of self-reliance.

(vi) To transform the institutional and technological base of agriculture with a view to attaining self-sufficiency in foodgrains, widening employment opportunities in agriculture and stemming the flow of labour to the cities.

(vii) To lay the ground were for an ambitions programme of population planning and control.

(viii) To accelerate the rate of development expenditure and remedy the glaring deficiencies in the traditionally neglected fields of social and human resources development by improvement in education, health, rural housing and water supplies etc.

Objectives of the Two Year Plan (1978-80) :

(1) To achieve a higher rate of growth of the economy.

(2) To develop the rural economy with special emphasis on increasing productivity as well as employment opportunities.

(3) To put greater reliance on domestic resources and reduce our dependence on foreign aid.

(4) To expand employment opportunities to arrest deteriorating poverty condition, improve income distribution and thereby promote social justice.

(5) To improve towards self-reliance in foodgrains at a faster rate.

(6) To reduce the rate of population growth further and lay the ground for accelerated decrease of population growth in the subsequent plan periods.

(7) Improve provision of basic needs such as food, clothing, drinking water, health services and education.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী (১৯৮০-৮৫):

জনসাধারনের নিদারুণ দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ইত্যাদির মত গুরুতর সমস্যাবলীর আলোকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে ।

(১) একটা সুসহ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাতে মৌলিক চাহিদার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান একটা লক্ষ্যনীয় উন্নতি বিধান করা যায়;

(২) সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা;

(৩) অর্থকরী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ ও প্রবৃদ্ধি সকলে অংশীদার হবার মতো আয় করতে ও সম্পদের অধিকারী হতে পারে;

(৪) মানব সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যবস্থা হিসেবে নিরক্ষরতা দূর করা ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করা;

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো;

(৬) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সাধন করে উন্নয়ন তৎপরতায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা;

(৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করে আরও বেশী স্বনির্ভরতা অর্জন করা ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী (১৯৮৫-৯০) :

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা

২। উৎপাদনক্ষম কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ

৩। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪। দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত্তি উন্নয়ন

৫। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা

৬। জনগণের সর্বনিম্ন মৌলিক প্রয়োজন মেটানো

৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাংগা করা

৮। স্ব-নির্ভরতা ত্বরান্বিত করা।

Fourth Five Year Plan (1990-95) Draft

Objectives of the Fourth Five Year Plan (1990-95) :

The Fourth Five Year Plan (1990-95) begins from July, 1990. As part of the perspective plan (1990-2010), the Fourth has the following major objectives :

(a) Accelerating economic growth. It is envisaged that the annual growth rate of GDP would be 5% during the plan period.

(b) Poverty alleviation and employment generation through human resource development.

(c) Increase self-reliance.